ষষ্ঠ অধ্যায়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) :

প্রাক্-গিরিশচন্দ্র যুগের পৌরাণিক নাটকগুলি পুরাণ কাহিনি ও চরিত্র অবলম্বন করে রচিত হলেও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির প্রয়োগ কৌশল এবং নবজাগরণের আলোকপ্রাপ্ত নাট্যকারের চিন্তভাবনা যুক্তি সমন্বিত আধুনিক মনই বড় হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ধর্ম দর্শনের আদর্শ, ভক্তিভাব, আবেগ, পাপ-পুণ্য সত্যাসত্যের দ্বন্দ্বে সত্যের জয় এবং শান্তরস ও ভক্তিরসের প্রতিষ্ঠা– গিরিশ যুগের পৌরাণিক নাটক গুলির আদর্শ পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নাটকে তেমনভাবে প্রকাশ পায় নি। ভারতীয়দের কাছে ধর্ম জীবন-সর্বস্ব; ব্যক্তিগত-জীবন, পারিবারিক-জীবন, সমাজ-জীবন, রাষ্ট্র সবকিছুই ধর্মকে অধিগত করে বিরাজিত। গিরিশচন্দ্র 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে লিখেছেন -

> ''ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম–ধর্ম। দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। . . .হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।''[১]

১৮৭৮ সাল থেকে গিরিশচন্দ্র তারকনাথের ভক্ত হন এবং শিবপূজায় ব্রতী হন। তিনি তারকেশ্বরে যান, হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, শিবরাত্রি পালন করেন। কালীঘাটে গিয়ে কাতর প্রাণে মহাকালীর কাছে প্রার্থনা জানান। ১৮৮৪ সালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পরিচয় হয় এবং ক্রমে তাঁর ভক্ত, শিষ্য ও স্নেহের পাত্রে পরিণত হন। রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্য লাভের পরবর্তী নাটক গুলিতে তাঁর জীবন ও বাণীর প্রভাব লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন -

> ''গুরুর কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া- সেই জন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ!''[২]

পুরাণের প্রতি গিরিশচন্দ্রের আশৈশব আকর্ষণের কথা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন -

> ''গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার করিয়া বলিতে পারিতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে বসিয়া সেই সকল গল্প শুনিতেন, এবং উহা তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিত যে, তিনি সকল সময়েই সেই কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পৌরাণিক চিত্র সকল মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে পরিণত বয়সে উৎকৃষ্ট পৌরাণিক নাটকাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি এইখানে।''[৩]

মহাভারত কাহিনি অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি হলো- অভিমন্যুবধ (১৮৮১), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮২), দক্ষযজ্ঞ (১৮৮৩) নলদময়ন্তী (১৮৮৩), প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪), শ্রীবৎসচিন্তা (১৮৮৪), জনা (১৮৯৪), পাণ্ডব গৌরব (১৯০০)। এই নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্র মূলত কাশীরামের আখ্যান অনুসরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের মহাভারত আশ্রয়ী নাটকগুলি সম্পর্কে উৎপল দত্ত লিখেছেন-

> ''গিরিশের নাট্যকৌশল পর্যন্ত মহাভারতের পথাশ্রয়ী। এক-এক পর্বে চরিত্রদের এক-এক চেহারা। গিরিশের মহাভারত-বিষয়ক নাটকগুলি যদি কেউ একত্র পড়েন, তবে একেকটি নাটক বিশাল এক মহাকাব্যের একেকটি পর্ব হিসেবে তাঁর সামনে উদিত হবে, সব মিলে এক অখণ্ড ও জীবনানুগ চিত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।''[৪]

গিরিশচন্দ্রের নাট্যিক প্রতিভার সহজ ও স্বাভাবিক ওজ্জ্বল্য পৌরাণিক নাটক রচনায়। তাঁর আগে পর্যন্ত পুরাণকাহিনি নিয়ে নাটক রচনা যাত্রাপালা ও গীতাভিনয়ের একটি ভিত গড়ে উঠেছিল, গিরিশচন্দ্র সেই ভিতের ওপর পৌরাণিক নাটকের ইমারত গড়ে তুললেন। বাঙালি জাতির হৃদয়ের আর্তি, ধর্মপ্রাণতা, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার ঐতিহ্য, পুরাণ ঐতিহ্য এবং পুরাণের প্রতি নাড়ীর টান -গিরিশচন্দ্র গভীর ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর হাতে পৌরাণিক নাটক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। মহাভারত অবলম্বনে রচিত তাঁর নাটকগুলির বিশ্লেষণ বর্তমান গবেষণা পর্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অভিমন্যুবধ (১৮৮১) :

মহাভারতের দ্রোণপর্বের অভিমন্যুবধ আখ্যান অনুসরণে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই নাটকটি রচনা করেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে নাটকটির অভিনয়ের পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে 'ভারতী' পত্রিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

> ''তাঁহার অভিমন্যুবধ, কি তাঁহার রাবণবধ এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দররূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে। . . . অভিমন্যুর নাম উচ্চারণ হইলেই আমাদের মনে যে ভাব উদয় হয়, অভিমন্যুবধকাব্য পড়িয়া সে ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না বরং সে ভাব আরও উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়া উঠে। যে অভিমন্যু বিশ্ববিজয়ী অর্জুন ও সুভদ্রার সন্তান, তাহার তেজস্বিতা তো থাকিবেই . . . অভিমন্যুবধের অভিমন্যু আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্যু–সেই কল্পনার আদর্শভূত অভিমন্যু। এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা অভিমন্যুকে পাইয়াছি–কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুভদ্রার সঙ্গে স্নেহ বিনিময়ে, কি সপ্তরথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহ মধ্যে বীরকার্য সাধনে—সকল স্থানেই এই নাটকের অভিমন্যু প্রকৃত অভিমন্যুই হইয়াছে।''[৫]

ভীষ্মের পতনের পর কৌরব সেনাপতি রূপে দ্রোণাচার্যের অভিষেক হলে তিনি পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবসত যুদ্ধে অর্ধোৎসাহী বলে দুর্যোধনের কাছে তিরস্কৃত হন। এরপরই দ্রোণাচার্যের চক্রব্যূহ নির্মাণের পরিকল্পনা, যেখানে বলি হবেন সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু। নাটকের জন্য আখ্যানের এই অংশটি অত্যন্ত উপযোগী এবং আকর্ষনীয়। অভিমন্যু আখ্যান সম্পর্কে মহাভারত সমালোচক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর ব্যাখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ –

> ''মহাভারত কোনো নাট্যগ্রন্থ নয় বটে, আমি এটিকে মহাকবির কাল্পনিক প্রতিভার বিশাল বিস্তার বলেও মনে করি না, কিন্তু কুমার অভিমন্যুর কথা স্মরণে এলেই কেমন যেন ভয়ঙ্কর গতি এবং পরিনতি-সম্পন্ন নাট্যাংশের কথা মনে হয়। অথচ এমনই সেই নাট্যাংশ যেখানে বুঝি তিনি ছাড়া আর কোনও নায়ক নেই, মহাভারতের ওই বিশেষ খণ্ডাংশে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন সব ম্লান হয়ে যান, এমনকী যাঁরা অভিমন্যুকে হত্যা করে বিজয়

লাভ করল, সেই বিজয়ী মহারথী বীরদের ওপর আমাদের ঘৃণা এবং ক্রোধ উদ্দীপিত হয়। কারণ তিনি অভিমন্যু, তিনি মহাভারতের বিরাট পুরুষদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতীক– চিরকিশোর নায়ক, মহাভারতের অন্যতম ট্র্যাজিক হিরো।''[৬]

নাটকের বিশ্লেষণের পূর্বে এই পর্বের কাহিনির ভূমিকাটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন। কুরুক্ষেত্রে ত্রয়োদশ দিনের যুদ্ধে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে অভিযোগ করেন –

''অভিমানী দুর্যোধন ক্ষুন্ন হয়ে দ্রোণকে বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনি নিশ্চয় মনে করেন যে আমরা বধের যোগ্য, তাই আজ যুধিষ্ঠিরকে পেয়েও ধরলেন না। আপনি প্রীত হয়ে আমাকে বর দিয়েছিলেন, কিন্তু তার অন্যথা করলেন। সাধু লোকে কখনও ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না। দ্রোণ লজ্জিত হয়ে উত্তর দিলেন, আমি সর্বদাই তোমার প্রিয়সাধনের চেষ্টা করি কিন্তু তুমি তা বুঝতে পার না। বিশ্বস্রষ্টা গোবিন্দ যে পক্ষে আছেন এবং অর্জুন যার সেনানী, সে পক্ষের বল ত্র্যম্বক মহাদেব ভিন্ন আর কে অতিক্রম করতে পারেন? সত্য বলছি, আজ আমি পাণ্ডবদের কোনও মহারথকে নিপাতিত করব। আমি এমন ব্যূহ রচনা করব যা দেবতারাও ভেদ করতে পারেন না। তুমি কোনও উপায়ে অর্জুনকে সরিয়ে রেখো।''[৭]

গিরিশচন্দ্রের নাটকের শুরুতে পিচাশ দলের সরা সরা রক্ত খাওয়ার উচ্ছাস গীত যতটা কৌতুক উদ্রেক করে, আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ততটা আভাসিত করে না। কৌরব শিবিরে উদ্বিগ্ন দুর্যোধনের সংলাপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিস্থিতি ব্যক্ত হয়েছে। পিতামহ ভীষ্মকে ছল কৌশলে ধরাশায়ী করেছে পাণ্ডবগণ। এখন তাঁর ভরসার স্থল দ্রোণাচার্য। কিন্তু পাণ্ডবদের প্রতি দ্রোণাচার্যের স্নেহাধিক্য থাকায় দুর্যোধন তাঁকেও অভিযুক্ত করেন, শ্লেষ বাক্য হানেন - 'রণস্থল ব্রাহ্মণের নয়'। আত্মশ্লাঘায় আঘাত লাগায় দ্রোণাচার্যও ফোঁস করে ওঠেন।

'আজি হতে, নহি সেনাপতি তোর।
চল পুত্র! যাই অন্য স্থান,
দুর্জ্জনের সহবাস নহে শ্রেয়ঃ কভু।'(১/২)

কৃপাচার্যের যথোচিত উপদেশে দুর্যোধন গুরুর চরণে বিগলিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কণ্ঠে কিছুটা অভিমানেরও সুর লেগেছে 'না বলে তোমারে/ বল বলিব কাহারে!' অতপর যুদ্ধের মন্ত্রণা স্থির হয় - সুশর্ম্মা অর্জুনকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখবেন, আর 'অর্জুন বিহনে' চক্রব্যূহের দ্বার রক্ষা করবেন জয়দ্রথ। ফলে কৃপাচার্য সংশয়িত হয়ে দ্রৌণাচার্যকে প্রশ্ন করেন, 'নিষ্পাণ্ডবা পৃথিবী কি/ প্রতিজ্ঞা তোমার?' দ্রোণাচার্য প্রত্যুত্তরে কিন্তু কোনো সম্ভাবনার কথাই বললেন না- 'একমাত্র রহিবে পাণ্ডব'। শ্রীমধুসূদনের 'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' স্তোত্রে পূর্ববর্তী সমস্ত পরিকল্পনা নসাৎ হয়ে যায়। কৌরবকুলের সেনাপতি হওয়ার পর দ্রোণাচার্যের মনেও আত্মসমালোচনা দেখা যায় –

'জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে,
কুক্ষণে হইনু অস্ত্রধারী!
যাগ যজ্ঞ মঙ্গল কামনা রত দ্বিজ
জীব-ক্ষয় বাসনা আমার!
যেই কর তুলিয়ে উল্লাসে,
আশীর্ব্বাদ করিছে ব্রাহ্মণ,
সেই করে করি নরনাশ,
দ্বিজকুলগ্লানি আমি!'(১/২)

জয়দ্রথের প্রতি স্নেহবসত দুর্যোধন তাকে ব্যূহদ্বারে নিযুক্ত করতে দ্বিধা প্রকাশ করে সেস্থলে কর্ণকে মূলরক্ষক রেখে জয়দ্রথকে পার্শ্ব রক্ষকের দায়িত্ব দিতে চেয়েছেন। কিন্তু জয়দ্রথ পূর্ব অপমানের কথা ব্যক্ত করে শিবের কাছে বর প্রাপ্তির উল্লেখ করেন। তাঁর নির্লজ্জ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে দ্রৌপদীকে পুনরায় রথে তুলে নিয়ে এসে সম্ভোগের লালসায়। দ্রোপদীকে নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে সংলাপ লক্ষণীয় –

জয়দ্রথ : সমরান্তে তোমায় আমায় বাদ,
সুন্দ উপসুন্দ যথা তিলোত্তমা হেতু!
দুর্যোধন : সে আশঙ্কা নাহি বীর!
দুই জন পঞ্চজন স্থলে!(১/৩)

রোহিণী ও গর্গমুনির ভাষণে দেবলোকের পূর্বকাহিনি নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। অভিমন্যুকে শাপগ্রস্ত দেবতার আদলে দেখা এবং তার লৌকিক মৃত্যু হবেনা বলে রোহিণীর আশঙ্কা নাট্যরসকে নষ্ট করে। অভিমন্যু যে সোমদেব সে কথা স্মরণে এনে উত্তরার সঙ্গে রোহিণীর সতিন সম্পর্কের কথা হাস্যকর। রোহিণী প্রতি মূহুর্তে অভিমন্যুর মৃত্যু কামনা করছেন, দৈবও তাঁর সহায়। কিন্তু অভিমন্যুর বীবত্ব তাঁকে সন্দিগ্ধ করে তুলছে, তিনি মুনির কাছে ব্যকুলতা প্রকাশ করছেন। মুনি জানালেন, 'যুঝে বীর উত্তরার আয়ুত-প্রভাবে।' তাই তিনি বললেন যে উত্তরার শিব-তপস্যা ভঙ্গ করতে, পাছে ভোলানাথ বর প্রদান করেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর বাস্তবতায় উৎপল দত্তের ব্যাখ্যা নাট্যকারের ভাবনাকে সম্প্রসারিত করে।

> ''গিরিশের সময়-চিন্তার স্বকীয়তা ও আধুনিকতা সুতরাং 'অভিমন্যুবধ' নাটককে এমন এক দার্শনিক মাত্রা দিয়েছে যেখানে অভিমন্যু ও অন্যান্য বীরদের আমরা দেখি এক নিরর্থক যুদ্ধের আত্মঘাতী নেশায় মত্ত–কালস্রোতে তাড়িত তৃণখণ্ডের মতন। ইতিহাসের প্রায় প্রতি যুদ্ধেই যা ঘটে এ-নাটকের কুরুক্ষেত্রে তাই ঘটেছে, যোদ্ধাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উর্ধ্বে যুদ্ধ তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে যমালয়ে প্রেরণ করছে, তাদের ব্যক্তিগত স্বপ্ন বা আকাংখা পদদলিত হচ্ছে। কালস্রোতের আনুকূল্যে যুদ্ধ এক প্রবল নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অভিমন্যু তাই পূর্ব থেকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত।''[৮]

নারায়ণীসেনা নিধনের লক্ষ্যে অর্জুনকে উদ্বুদ্ধ করেন কৃষ্ণ। কিন্তু অর্জুনের আশঙ্কা তিনি কাছে না থাকলে একা ভীম যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করতে পারবেন না। শ্রীকৃষ্ণ ভীমের সহকারী রূপে অন্যান্য বীরের সঙ্গে ঘটোৎকচের উল্লেখ করলেও কুরুযুদ্ধে ঘটোৎকচকে দেখা যায় অভিমন্যু বধের পরে। পাণ্ডবেরা বধযোগ্য নয় বলে, তাঁদের রক্ষার্থে সন্তানেরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, ইলাবন্ত, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, এমনকি পরীক্ষিৎ পর্যন্ত রেহাই পাননি। সন্তান বিসর্জন দিয়ে আত্মরক্ষা-এটা বোধহয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম স্ট্র্যাটিজি।

শিব কর্তৃক পূজা অগ্রহণের একটি কারণ উত্তরার সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশের প্রচেষ্টা রয়েছে- 'ভূতনাথে করিতে অর্চ্চনা/ প্রাণনাথে মনে পড়ে।' যুদ্ধের পরিনাম ভেবে অভিমন্যুর

জন্য ভীতসন্ত্রস্ততা বালিকা উত্তরা বনবাসী জীবনকেও শ্রেয় মনে করেছে, 'কাজ নাই রাজ্য ধনে মম,/ বনে রব বাকল বসনে তোমা লয়ে।' মাতা সুভদ্রা বাৎসল্য অতিক্রম করে ক্ষত্রিয় বীরাঙ্গনার মতো উচ্চারণ করেছেন-

'ত্যজ মোহ বীরবালা,
বীরকুল-রীতি স্মরি;
মমতা ছেদিতে,
শিখে মা ক্ষত্রিয়-সুতা ভূমিষ্ঠ হইয়ে।'(২/১)

উত্তরা অভিমন্যুকে যুদ্ধে যেতে দিতে চান না, কিন্তু অর্জুন পুত্র যুদ্ধে ভীত হয়ে অন্দরমহলে থাকবার পাত্র নন। অভিমন্যু গণককে উৎকোচ দিয়ে ভবিষ্যৎ ঘুরিয়ে দেবার স্পর্ধা দেখিয়েছেন।

'ঘোর রণ উপস্থিত প্রাতে!
যাই দ্রুত,
পারি যদি কুলাইতে সময়ের ব্যয়।'(২/৩)

''এ শুধু হারানো সময় নয়, সময়ের ব্যয় কুলায় মানুষ–জীবন দিয়ে।''[৯] যে কালস্রোত, ঘটনা পরম্পরা বালককেও যুদ্ধের ঘুর্ণাবর্তে টেনে আনে তারই দৃষ্টান্ত অভিমন্যুর মৃত্যু। সপ্তরথীর মাঝে একাকী নির্ভিক যোদ্ধা অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের চোখও আর্দ্র হয়।

মহাভারতের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিমন্যু আখ্যান অবলম্বনে রচিত গিরিশচন্দ্রের নাটকে পুরাতন কাহিনিকে নতুন রূপে খুঁজে পাওয়া যায়। পৌরাণিক নাটক রচনার প্রথম পর্যায় হলেও নাট্য ঘটনা ও চরিত্র নির্মাণে নাট্যকারের পুরাণ চেতনা অভিনব দার্শনিক মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কাশীরামের আখ্যান প্রায় অবিকৃত রেখে নাটকে মহাকাব্যের ট্র্যাজিক সম্ভাবনা অভিমন্যুর মৃত্যু পিপাসায় নিমজ্জিত হয়েছে।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮২) :

মহাভারতের বিরাটপর্বের কীচক বধের রগরগে কাহিনি নিয়ে রচিত বেশকিছু যাত্রাপালা বা গীতিনাটক উনিশ শতকে জনপ্রিয় হয়েছিল। দ্রৌপদীর প্রতি কীচকের কাম-বাসনা সমসাময়িক দর্শকের রুচিকে চরিতার্থ করেছে। বলাই বাহুল্য গিরিশচন্দ্রের নাট্যবোধ বিদ্যাসুন্দরীর অশ্লীলতার উর্ধে অজ্ঞাত পরিচয়ের আবরণে আত্মবিস্মৃতির সংকটকে তুলে ধরেছে। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের প্রথম প্রকাশের পর গিরিশচন্দ্র পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তার সংস্কার করেছিলেন। প্রচলিত 'গিরিশভবন' সংস্করণের পাঠের সঙ্গে 'বসুমতী' কর্তৃক প্রকাশিত নাটকে কিছু ভিন্ন পাঠ লক্ষ্য করা যায়। কীচকের 'তুঙ্গ কুচ কমলযুগল/ মর্দিব নির্দয় করে' -ইত্যাদি সংলাপ বর্জিত হয়ে পরবর্তী সংস্করণ অনেক মার্জিত ও কাব্যগুণসম্পন্ন হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের এই নাটকটি সম্পর্কে অনেকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য -

> ''পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে প্লটের গাঁথুনি, চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনা সংস্থাপন, গীতযোজনা সবদিক থেকেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাটক। কাশীরাম দাসের মহাভারত অবলম্বনে রচিত এই নাটকটিতে প্রত্যেকটি চরিত্র নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। ভীমের প্রতিশোধস্পৃহা, বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের চিত্তক্ষোভ, কীচকের কাম-লালসা, দ্রৌপদীর রোষদীপ্ত ব্যঙ্গ নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। সবার উপরে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী চরিত্রটি মহাভারতীয় তেজস্বিতা বহন করে। কীচক চরিত্রটিও জীবন্ত। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে মুদ্রিত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরচিত অজ্ঞাতবাস নাটকে কীচক চরিত্র প্রাণহীন হইয়া চিত্রিত হইয়াছিল।''[১০]

গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকটির মূল অভিপ্রায় সম্পর্কে উৎপল দত্ত লিখেছেন -

> ''পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস গুপ্ত পরিচয় থেকে লুপ্ত পরিচয়ের সম্ভাবনার বুদ্ধিদীপ্ত নাটক। পাণ্ডবেরা অন্য পরিচয়ের পেছনে আত্মগোপন করেছেন। কিন্তু এই কৃত্রিম নূতন পরিচয় তাঁদের প্রকৃত পরিচয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কাপুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে তাঁরা কাপুরুষতায় আক্রান্ত হচ্ছেন।''[১১]

কাশীরাম দাসের আখ্যানে পাণ্ডবগণ যে ছদ্মবেশের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন -

যুধিষ্ঠির : রাজা বলে কহি আমি বঞ্চিব যেমতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাট সভাতে।।
বলাইব কঙ্ক নাম পাশায় পণ্ডিত।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানি সর্ব্বনীত।।

ভীম : বল্লব নামেতে আমি হব সূপকার।
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার।।

অর্জুন : নপুংসক বেশে আমি আচ্ছাদিব কায়।।
দুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খ আচ্ছাদনে।
মস্তকে ধরিব বেণী কুণ্ডল শ্রবণে।।

নকুল : অশ্ব-বৈদ্য নাহি কেহ আমার সমান।
অশ্বের চিকিৎসা জানি গ্রন্থিক আখ্যান।।

সহদেব : গোধন রক্ষক হব জাতিতে গোয়াল।
মৎস্যদেশে জানাইব নাম তন্ত্রিপাল।।

দ্রৌপদী : তাঁরে কব সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম আমি জানি।
শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী।।[১২]

নাটকে বিরাটরাজের কাছে ব্রাহ্মণবেশে যুধিষ্ঠির আশ্রয় লাভ করেছেন। নিজের সম্পর্কে জানিয়েছেন, 'ব্রহ্মচারী আমি/ হবিষ্য–ভক্ষণ, আসন–ধরণীতল।' ভীমও নিজেকে ব্রাহ্মণ জাতির সূপকার বলে পরিচয় দিয়েছেন। সকলের ক্ষেত্রেই বিরাটের মনে হয়েছিল ক্ষত্রিয় লক্ষণ যুক্ত। বিরাট যুধিষ্ঠিরের কাছে জানতে চেয়েছেন যে পাণ্ডবভবনে এই পাঁচজন ছিল কিনা। ধর্মরাজ কৌশলে বলেছেন, যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে অনেকেই ছিল, সবাইকে তিনি চেনেন না। মহাভারতে পাণ্ডবেরা যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে ছিলেন বলেই পরিচয় দিয়েছেন। দ্রৌপদীকে আশ্রয় দিতে গিয়ে সুদেষ্ণার মনে হয়েছে -

'হেরিলে তোমারে মদনে মাতিবে রাজা
সাধে কেন বিষাদ কিনিব'

নাটকে বিরাটরাজকন্যা উত্তরাকে বেশি প্রধান্য দেয়া হয়েছে। উত্তরা অর্জুনের গান শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়েছে যে তান-লয়ে মনোনিবেশ করতে পারেনি তাই সে দ্রৌপদীর কাছে শিখে নিতে চাইছে, যেহেতু দ্রৌপদী এই গান ইন্দ্রপ্রস্থে থাকাকালীন শুনেছেন। বৃহন্নলার সঙ্গে সৈরিন্ধীর সম্পর্ক কল্পনা করেছে উত্তরা- 'শোক,–নপুংসক বৃহন্নলা,/ নহে ক্ষম গুণবতি,/ যোগ্য নারী তুমি তার।' গানের প্রতি মনোনিবেশের থেকে উত্তরার বেশি আগ্রহ কথোপকথনে। দ্রৌপদীর কন্যা থাকলে উত্তরা তার সহচরী হতো। বৃহন্নলারূপী অর্জুনের কন্যার অস্তিত্ব কল্পনা করে উত্তরা তার সঙ্গে সখী পাতানোর স্বপ্ন দেখে। সবই বালিকা সুলভ কথা। কিন্তু এরপর যে কথাটি বলেছে তা আজকের দিনে কানে লাগে, 'আহা! কি পাপে গো হয় নপুংসক।' গানে মনোনিবেশের চেয়ে অর্জুনের বিগত জীবনের কথা, দ্রৌপদীর দুখঃকথা জানার প্রতিই তার কৌতুহল বেশী। কীচকের পদাঘাতে দ্রৌপদীর দুঃখে ব্যথিত হয়েছে উত্তরার হৃদয়, বৃহন্নলা যদি কীচককে বোঝায় তাহলে হয়ত মাতুল শান্ত হতে পরেন, ভেবে উত্তরা সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছে, চেয়েছে সৈরিন্ধ্রীকে লুকিয়ে রাখতে। বৃহন্নলা এবং সৈরিন্ধ্রীর মধ্যে সম্পর্কের সেতু তার চোখে পড়েছে, 'বৃহন্নলা, সৈরিন্ধ্রীকে ভালবাস-/ তবে কেন কভু নাহি কও কথা'। সৈরিন্ধ্রী যে সামান্য নারী নয় এটা উত্তরার চোখ এড়ায়নি। বৃহন্নলার উদ্দেশ্যে উত্তরার পাকাপাকা কথা ও অর্জুনের বাৎসল্যরসস্ফীতি নাটকের গতিকে ব্যহত করেছে। পঞ্চপাণ্ডবদের ছদ্মবেশের ইঙ্গিতও উত্তরার স্বপ্নের ভেতর জানান দেয়।

কামবাণে বিদ্ধ কীচকের সম্প্রসারিত রিরংসার জিহ্বা দ্রৌপদীকে আস্বাদন করতে উন্মত্ত হয়েছে। সুদেষ্ণার কাছে তাঁর নির্লজ্জ আবদার - 'প্রাণ যায় কহিনু তোমায়,/ না দিলে তাহারে হইবে সোদরঘাতী।' সুদেষ্ণা নানা উপদেশে তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেন, গান্ধর্ব পঞ্চস্বামীর ভয় দেখান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কীচক সুদেষ্ণাকে নিজের স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হন। কাশীরাম কীচকের নির্লজ্জতাকে লজ্জা দিয়েছেন -

''ভগিনী-নিকটে যাহা বলা নাহি যায়।
কামে হতচিত্ত হয়ে লজ্জা নাহি পায়।।''[১৩]

ক্লীবের জীবন অর্জুনের কাছে ক্রমশ দুর্বিসহ হয়ে উঠছে, 'ওহোহ, ক্লীবত্ব আমার!/ অরির শোণিতে জ্বালা কি নিভিবে কভু?' নিরুপায় দ্রৌপদী রাত্রির অন্ধকারে ভীমের কাছে এসেছেন, তার ক্ষোভ বিস্ফারিত হয়েছে, অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যদি মৃত্যুও ঘটে তবু সে প্রস্তুত, রাজত্বের লোভে এভাবে নিজেকে আত্মগোপন করাকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন -

'অজ্ঞাতে পাণ্ডব নাম হোক্ অবসান
অপমান গোপনে রহিবে
মুক্ত ভাষে কহি-
দুর্যোধন দুঃশাসন রহুক কুশলে।'(২/৭)

দ্রৌপদীর আত্মধিক্কারেও কিন্তু ভীমকে কেমন শান্ত দেখাচ্ছে, ভীমও যুধিষ্ঠিরের শীতলতা প্রাপ্ত হয়েছেন। পৌরুষের প্রতি দ্রৌপদীর তীব্র কটাক্ষ- 'ভার্য্যা হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে,/ ভার্য্যা মাত্র পণের কারণ!' দ্রৌপদীর তীব্রতর ভাষণে ভীম উত্তেজিত হয়েও 'ধর্ম্মরাজে না লঙ্ঘিব' বলে দ্বিধান্বিত হন। দ্রৌপদী চিরবিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইলে ভীম গোপনে কীচক বধের পরামর্শ করেন। এই দৃশ্যে দ্রৌপদীর ছেনালি ব্যবহার কীচককে মোহান্ধ করেছে- কীচকের কবিত্বের প্রশংসা করে দ্রৌপদী বলেন, 'কালি গিয়েছে প্রহার/ আজি বুঝি দিন কবিতার?' নাটকে কীচকের গৃহে দ্রৌপদীর গমনপর্ব কতগুলি নেপথ্য গীতের দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে।

মহাভারতের বিরাটপর্বে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি পর্বের শেষের দিকে কিন্তু নাটকে শ্রীকৃষ্ণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুনিপুণ নাট্যঘটনার প্রশংসা করে সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন -

> ''পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালীন ঘটনাবলীর কোনটি যাহাতে পরিত্যক্ত না হয়, সে বিষয়ে যেমন নাট্যকার এখানে লক্ষ্য রাখিয়াছেন, আবার কোন ঘটনাই যাহাতে অনাবশ্যক প্রাধান্য লাভ করিয়া পূর্ববর্তী ঘটনা ম্লান করিয়া না দেয়, তাহাও নাট্যকার লক্ষ্য করিয়াছেন। সমগ্র নাটকের মধ্যে দুইটি চরিত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে-তাহা শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর চরিত্র। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হইলেও নাট্যকার ইহার মধ্য দিয়াই তাঁহার পরিকল্পিত

কৃষ্ণচরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি সহজভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই কৃষ্ণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকের ধ্যানের আনন্দ, দীনতারণ।''[১৪]

ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মার বিরুদ্ধে মৎসরাজ বিরাটের আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ আলোচনায় গোপদ্বয়ের দুর্যোধনকে 'যুযোধন' এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কে 'ভস্মা, দোনা, কানা' বলে উল্লেখ করার মধ্যে অমার্জিত উচ্চারণের চেয়ে রঙ্গব্যঙ্গই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। আশ্রয়দাতা বিরাটরাজের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য দ্রৌপদী অর্জুনকে উত্তেজিত করছেন, তাঁর কীবত্বকে ধিক্কার দিচ্ছেন- 'হেন শিক্ষা মৎস্যনারী সহবাসে!' বিরাট রাজপুত্র উত্তর উপযুক্ত সারথির সন্ধান করায় দ্রৌপদী বৃহন্নলার পরিচয় দিয়েছেন, খাণ্ডবদাহনে অর্জুনের সারথী ছিল এই বৃহন্নলা। উত্তরের জিজ্ঞাসায় বৃহন্নলার ভনিতা- 'জানি মাত্র অশ্ব-সঞ্চালন/ ভ্রমিতাম দ্রৌপদীকে লয়ে'। যুদ্ধের ভয়ে পলায়মান উত্তরের পেছেনে ধাবমান বৃহন্নলার দীর্ঘ বেণী দেখে বিপক্ষীয় সেনানায়কদের অনুমান এবং দ্রোণাচার্য তাকে অর্জুন বলে উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণের বিদ্রূপাত্মক টিপ্পনী - 'হাঃ হাঃ, হে আচার্য,/ কতদিন নারী-বিদ্যা দিয়েছ অর্জ্জুনে?' সম্মূখ যুদ্ধের বিধ্বংসী রূপ দেখে ভয়ার্ত উত্তরের মনেহয়েছে বৃহন্নলা রূপই ভালো ছিল- 'বৃহন্নলা ছিলে ভাল/ এ মত্ততা কি হেতু জন্মিল?' সৈন্য নাশ করতে করতে অর্জুনের এক সময় মনে হলো- 'পরকার্য্যে করিলাম বহু জ্ঞাতি ক্ষয়,/ কি কহিবে ধর্ম্মরাজ শুনে।' শকুনির ভীরু অভিব্যক্তি কমিক চরিত্রের সদৃশ। দুঃশাসন তার বন্ধনমোচন করতে গেলে শকুনি বিপক্ষ সৈন্য বোধে ভয়ে চক্ষু মুদে প্রাণ নাশ না করার আর্তি জানান।

কৃষ্ণ উপস্থিত হয়েছেন দ্রৌপদীকে খানিকটা উস্কে দিতে, না কি না যদি দুর্যোধন সন্ধি স্বীকার করে নেন শান্তি প্রিয় যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবে তাহলে তো পাঞ্চালীর আর বেণীবন্ধন করা হবে না। আপাত নিরপেক্ষ যাদব প্রধানকে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে আত্মাহুতি দেবেন বলে কৃষ্ণের অনুকম্পা লাভের জন্য সচেষ্ট হন দ্রৌপদী। কৃষ্ণ তাঁকে মন্ত্রনা দিলেন- 'পঞ্চজনে উত্তেজনা-ভার তব।' মৎস্যরাজের সিংহাসনারূঢ় পঞ্চভ্রাতা ও পাঞ্চালি কে দেখে বিরাটরাজের বিস্ময়ের প্রত্যুত্তরে উত্তর যুধিষ্ঠিরাধির পরিচয় দিলে বিরাটরাজ সঙ্গে সঙ্গেই তার কন্যা উত্তরাকে

অর্জুনের কাছে সমর্পন করতে উদ্যত হন। অর্জুন সকলের অনুমতি ক্রমে অভিমন্যুর জন্য উত্তরাকে পুত্রবধু রূপে গ্রহণের কথা বললেন। অভিমন্যুর সঙ্গে মিলনের পূর্বরাগে সুর ভেসে আসে উত্তরার কণ্ঠে। চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ব্রাহ্মণ উত্তরা সম্পর্কে নেতিবাচক ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করেছেন- 'শীগ্গির খুলবে হাতের রুলি' অভিমন্যুর শোণিতের যুদ্ধের দামামা নবপরিণীতার সুখস্বপ্নকে ধ্বংস করে দেয়, উত্তরা তাই বলে- 'ধর তুমি কুমারীর বেশ।'

নাটকের পরিনতি সম্পর্কে সমালোচক উৎপল দত্তের মন্তব্য -

> ''পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস এক শোচনীয় আশাভংগের কাহিনী, অর্জুনদের এক বিচ্ছিন্নতা থেকে আর এক নিশ্ছিদ্রতর বিচ্ছিন্নতায় পদার্পণের কাহিনী, অন্ধকার থেকে গভীরতর অন্ধকারে গমনের কাহিনী। উত্তরা অভিমন্যুকে নারীবেশ পরাতে চেয়ে একথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, অর্জুন নপুংসক হয়েই ছিলেন ভাল। তাঁর প্রকৃত পরিচয় ফিরে পেয়ে তিনি যে গৃহযুদ্ধের নরহত্যায় মাতবেন, সে হত্যালীলা তাঁকেই করবে সম্পূর্ণ আত্মীয়হীন, তাঁর পুত্রও বাঁচবেন না। মিথ্যা পরিচয়ই হয়তো এই হতভাগ্য মানুষগুলির পক্ষে শ্রেয়ঃ ছিল।''[১৫]

বাস্তব জীবনে কখনো কখনো এমন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, মানুষ আত্মপরিচয়ের সংকটে ছদ্মবেশের অন্তরালে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন তার নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে। গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকটি সেই identiry crisis -এর নাটক। মহাভারতের বিরাটপর্বে পাণ্ডবদের ছদ্মবেশ ধারণের লুকোচুরি মাত্র এই নাটকের লক্ষ্য নয়। পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে নাট্যকার আধুনিক জীবনের প্রতিকল্প রচনা করেছেন। পাণ্ডবদের ক্লীবত্বে দ্রৌপদীর তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের ইন্দন ভয়াবহ যুদ্ধের প্রতিশোধ স্পৃহায় রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের অনুপ্রেরণার বিপরীতে উত্তরার যুদ্ধবিমুখতা- দুটি ভিন্নমুখী মতাদর্শ নাটকে স্থান পেয়েছে। উত্তরাকে নতুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার।

দক্ষযজ্ঞ (১৮৮৩) :

মহাভারতে দ্রোণপর্ব, শল্যপর্ব ও শান্তিপর্বে দক্ষ-সতী-শিব সংক্রান্ত যে সকল তথ্য রয়েছে সেগুলিকে ক্রমান্বয়ে লক্ষকরলে পুরাণ কাহিনির একটি প্রতিরূপ স্পষ্ট হয়। দ্রোণপর্বের শেষে ব্যাসদেব অর্জুন কছে রুদ্রমাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের যে বর্ণনা দেন -

> ''দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্দ্দয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণপরিত্যাগপূর্ব্বক ভীষণ নিনাদ করিতে লাগিলেন। তখন সুরগণ কেহই শান্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।''[১৬]

আবার, মহাভারতের শান্তিপর্বে জনমেজয়ের অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বৈশম্পায়ন কর্তৃক 'শিবহীন দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণে'র সঙ্গে এই নাটকটির পৌরাণিক যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

পুরাণের দক্ষযজ্ঞের কাহিনি অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের পূর্বে মনোমোহন বসু 'সতী' নাটক রচনা করেছিলেন। মনোমোহনের নাটকে গার্হস্থ্য জীবনরসের আধারে পারস্পরিক সম্পর্কের টানা পোড়নে নাট্যকাহিনি গড়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রাধান্য পেয়েছে বিনাশের বিরুদ্ধে সৃষ্টির জয়গানে দক্ষের অসম্ভব প্রচেষ্টা এবং মহামায়ার তত্ত্ব প্রকাশ। প্রকৃতির চক্রাকার শৃঙ্খলে ধ্বংস ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয় বলে, ধ্বংসের কারিগর অনাদি দেবকে উপেক্ষা করার স্পর্ধায় দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড হয়।

'যে নিয়মে চলিছে সংসার
সে-নিয়ম না রাখিব আর;
অন্য প্রথা করিব প্রচার।
সৃষ্টি, স্থিতি,
সংহারের নাহি প্রয়োজন
অনন্ত এ স্থান,
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।'(২/২)

উৎপল দত্ত মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গিরিশচন্দ্রের নাটকের ব্যাখ্যা করে দক্ষের চারিত্রিক শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন -

> ''ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গিরিশের আর এক যোদ্ধা দক্ষ। দৈবে তিনি বিশ্বাস করেন না। দক্ষের পুরুষকারের পিছনে শক্তি–তিনি মানবসমষ্টির মুখপাত্র, তিনি প্রোমেথিউস।''[১৭]

পৃথিবীতে জীবনের ধারা অব্যহত রাখার জন্য মহাপ্রলয়ের নটরাজ শিবকে মুগ্ধ করার উদ্দেশ্যে মহামায়ার দক্ষের কন্যা সতী রূপে জন্ম গ্রহণ এবং তপস্বিনীর সতীকে শিব পূজা শেখানোর প্রতিশ্রুতিতে নাট্যকাহিনির সূত্রপাত। সতীর দেবীরূপ দর্শনে মাতা প্রসূতির মনে আশঙ্কার উদয় হয়েছে। প্রসূতি চরিত্রে মেনকার ছায়াপাত ঘটলেও তপস্বিনী চরিত্রটি নাট্যকরের মৌলিক সৃষ্টি। দক্ষরাজ যতই স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে চান না কেন প্রসূতির সংস্কার এই যে, জীবিত মানুষকে দেবীরূপে দেখলে তার অকল্যাণ হয়। রাণীর শঙ্কা নিরসনের জন্য দক্ষরাজ যাগযজ্ঞের মাধ্যমে মনতুষ্টির নির্দেশ দেন। মহাদেব যেহেতু ধ্বংস যজ্ঞের হোতা তাই দক্ষের মনে হয়েছে-

> ‘লয় নিবারণ হবে না কখন,
> আনাচারি শিব-নিবারণ বিনা।’(১/৩)

সতীকে মহাদেবের কাছে অর্পণ স্বয়ং ব্রহ্মারও আভিপ্রায়। দক্ষ নিজ কন্যা সতীকে স্বয়ংবরা করতে চান। সতীর মহাদেবকে বরণ করে নেয়ার সম্ভাবনাকে দক্ষ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। দক্ষরাজের ধারণা তাঁর কন্যার রুচিবোধের কৌলীন্যে ভূতনাথ অপাঙ্‌তেয়, অথচ সতী তপস্বিনীর কাছে ভোলানাথের জন্য ব্যকুলতা প্রকাশ করেছেন –

> ‘দেখাইতে পার কি ভোলারে
> ভোলা কেন গো সন্ন্যাসী?
> হয় সাধ মনে, আনি তারে,
> করি তারে গৃহবাসী।’(১/৪)

তপস্বিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর অতি দ্রুতই তাদের মধ্যে আন্তরিকতা দেখা যায়। মহাদেবেকে দর্শন করার জন্য সতীর মনের তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। মহাদেবের শ্মশান বাসের কারণ হিসেবে তপস্বিনী জানিয়েছেন যে ব্রহ্মলোক, গোলোক, অমরপুরী দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে শিব ভূতপ্রেত হীনজনদের প্রতি স্নেহ বসত তিনি শ্মশানে বাস করেন। শিব স্তব করতেই ভোলানাথ দর্শন তো দেনই, একেবাবে মল্য বিনিময় করে মূহুর্তের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করেন। বিয়ে বা স্বয়ম্বর সমন্ধে সতীর কোনো ধারণা নেই। সতীর আচরণ এখানে নিতান্ত বালখিল্য। বিয়ে কি, বর কি –এই সব প্রশ্ন সে তার মার কাছে জানতে চেয়েছে। আবার, শিবের প্রতি দক্ষরাজের তাচ্ছিল্যের কথা শুনে সতী মূর্চ্ছা যান। সতীর স্বয়ম্বর সভায় শিব অনুপস্থিত ভেবেই দক্ষরাজ ঘোষণা করেন –

‘যার গলে তনয়া অর্পিবে হার,
হোক হীন, হোক নীচাচার,
কদাকার কিম্বা হীন জাতি কিবা,
তারে কন্যা করিব অর্পণ।’(১/৫)

দক্ষ নিজ বাক্যানুসারে কন্যা সম্প্রদান করলেন কিন্তু কন্যার সঙ্গে সম্পর্কও ছেদ করেন। ভৃগুপত্নীর সংলাপে যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা জানা যায় যেখানে সকল দেবতা দক্ষরাজকে প্রণাম করলেও শিব উদাসীন ভঙ্গিতে থাকেন। কেননা ত্রিভুবনে হেন শক্তি নেই যে মহারুদ্র নমস্কার সহ্য করতে পারেন। ব্রহ্মা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, রুদ্রদেব প্রণাম করলে দক্ষের মুণ্ড নিপাত যেত। পুরাণে দক্ষের মুন্ডুর পরিবর্তে ছাগমুন্ড প্রতিস্থাপনের অনুসঙ্গটি নাটকে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল। অপমানে দক্ষ মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন যেখানে শিব অনিমন্ত্রীত, এমনকি –

‘শিব নাম যে আনিবে মুখে,
দক্ষালয়ে নাহি স্থান তার।’(২/২)

রাজমন্ত্রী দক্ষকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছেন রাজ্যের মঙ্গলের জন্য শিব তুষ্টির প্রয়োজনের কথা। কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই নিয়ম থেকে সংহারকে বাদ দিতে চান দক্ষরাজ।

‘সংহারের নাহি হবে প্রয়োজন
অনন্ত এ স্থান,
রহিবে অনন্ত প্রাণী সুখে।’(২/২)

দক্ষরাজ নারদকে শিবহীন যজ্ঞের কথা প্রচারের ভার দেন এবং তাঁর এই যজ্ঞে যিনি অনুপস্থিত থাকবেন তাঁর স্থান প্রেতপুরে হবে বলে নির্দেশ দেন। জীব সংহারের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেন। শিবের সঙ্গে দ্বন্দ্বের পরিণামের কথা ব্রহ্মা দক্ষকে বোঝাতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মধ্যে মহাদেবই যে শ্রেষ্ঠ তা তিনি পূর্ব-কাহিনি উল্লেখে ব্যক্ত করেছেন। শব দেহের দুর্গন্ধে বিষ্ণু পলায়ন করেছিলেন, ব্রহ্মা চারদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার চতুর্মুখ হয়, আর ‘অবিকার পঞ্চানন ধরিল শবেরে’ তাই জগদ্‌গুরু মহাদেব পুরুষ প্রধান। পুরাণের কাহিনি দক্ষ ও শিবের রোষ মান-অপমানের নিরিখে গড়ে উঠেছে কিন্তু গিরিশচন্দ্র চিরাচরিত কাহিনিতেই ভিন্নতর দর্শনের প্রকাশ ঘটালেন। ‘এই শিব, এই পুনঃ শব–/এই সৃষ্টি, সৃষ্টির বিপ্লব।’

‘অভিমন্যুবধ’ বা ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’ মহাভারতের মূল কাহিনির সঙ্গে সম্পৃক্ত, ‘দক্ষযজ্ঞ’ গৌণ সম্পর্কে যুক্ত। দক্ষের প্রজাবৃদ্ধির প্রয়াস ও সতীর দেহত্যাগের ফলে শিবের ক্রোধানলে যজ্ঞপণ্ড হওয়ার কাহিনিকে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে উপস্থাপন করেছেন সৃষ্টি ও ধ্বংসের দুই বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতায়। সতীর বালসুলভ আচরণে কোথাও ‘কুলীনকুল সর্বস্বে’র কিঞ্চৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। নাটকে দক্ষযজ্ঞের শিব মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের ভোলানাথ নয়। গিরিশচন্দ্র দক্ষ চরিত্র নির্মাণে পুরাণকে নবরূপে আবিষ্কার করেছেন।

নল-দময়ন্তী (১৮৮৩)

মহাভারতের বনপর্বে পাণ্ডবদের কাম্যকবনে অবস্থানকালীন বৃহদশ্ব মুনির কাছে যুধিষ্ঠির নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা ব্যক্ত করলে মুনিবর ততোধিক দুর্দশাগ্রস্থ নল রাজার উপাখ্যান বর্ণনা করেন। নল-দময়ন্তীর পরস্পরের প্রতি মিলনাকাঙ্ক্ষা, দৈববিপাক উত্তীর্ণ হয়েও কলির কোপে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা এবং শেষ পর্যন্ত পুনর্মিলন কাহিনির নাট্যরূপায়ণে গিরিশচন্দ্র মহাভারতের প্রচলিত আখ্যানকেই অনুসরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের বহুপূর্ব থেকেই 'নল-দময়ন্তী' যাত্রাপালার প্রচলন ছিল। কিন্তু সে সকল যাত্রাপালা ছিল নিম্নরুচির। ঈশ্বরগুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে প্রচলিত পালা সম্পর্কে জানিয়েছেন -

> ''কালিয়দমন, বিদ্যাসুন্দর, নলোপাখ্যান প্রভৃতি যাত্রার আমোদ আছে কিন্তু তত্ত্বাবৎ অত্যন্ত ঘৃণিত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহাতে আমোদ-প্রমত্ত ইতর লোক ব্যতীত ভদ্রসমাজের কদাপি সন্তোষ বিধান হয় না।''[১৮]

গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে কাশীরামের আখ্যান অনুসরণ করেছেন। মহাকাব্যের হংসদূত নাটকেও বার্তা বহন করে এনেছে। কাশীরামের কাব্যে পূর্বরাগের লক্ষণ –

> ''নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
> কাম-দাবানলে দগ্ধা যেমন হরিণী।।
> দময়ন্তী-রূপ নল শুনি লোকমুখে।
> সদাই অস্থির রাজা শর বাজে বুকে।।''[১৯]

দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে যাওয়ার পথে নল রাজার উপর নেমে আসে দেবতার গ্রাস। ইন্দ্র, বৈশ্বানর, শমন, বরুন এই চারজন দময়ন্তী লাভের আকাঙ্ক্ষায় নলকেই দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করেন। নল তাঁর প্রেমাভিলাস দেবতার পায়ে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। প্রেমিকের উপর দেবতাদের নির্লজ্জ দাদাগিরিকে মর্ত্যের মানব প্রেমিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেয়ার পরিবর্তে বিনম্র ভক্তিতে অবনত হয়েছেন।

''ইন্দ্র বলে আমি ইন্দ্র ইনি বৈশ্বানর।
শমন বরুণ এই জলের ঈশ্বর।।
সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হয়ে যাহ তথাকারে।।''[২০]

নাটকে দেবতার অভিলাষ পুরণে নলের মনে সামান্য দুর্বলতা দেখা দিলেও মহাকাব্যের কর্তব্যবোধ দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছেন। দেবতার বাঞ্ছিত বলে দময়ন্তীকে নলরাজ আর নিজের বলে ভাবতে পারছেন না। নাটকে ভীরু প্রেমিক নলের সংলাপে তার দুর্বল মনের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে -

'দেবাঙ্গনা মিলাইব দেব-সনে;
আরে রে অবোধ মন!
যদি ভালবাস,
সুখে তার কি হেতু অসুখী তুমি?'(১/১)

ইন্দ্র চরিত্রের সমালোচনা করার স্পর্ধা দেখান নি নলরাজ। তিনি ভীরু প্রেমিক, দেবতার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার সাহস তাঁর নেই। নাটকে এই ঘটতি বিদূষক প্রতিপূরণ করেছেন। বিদূষক দৈব সমালোচনায় যেমন মুখর আবার নল রাজার প্রতিও তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন।

বিদূষক : এ তো বড় বাড়াবাড়ি দেবতার।
এ আবদার কেন, রাজা?
মহারাজ, দেবতাদের ত বিলক্ষণ!
যারে তারে প্রয়োজন!
মর্ত্যে এলো মানবী-আশায়!
মহারাজ, কেমনে জানিলে?
নল : কৃপা করে বলেছেন তাঁরা মোরে।
বিদূষক : আহা, অতুল করুণা
আর কৃপা করি যাবেন দময়ন্তী লয়ে! (১/৩)

দময়ন্তী দেব-অভিপ্রায় অতিক্রম করে নিজের প্রেমাকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা দিতে নলরাজাকে সচেতন করায় সচেষ্ট হন।

'আমি নারী, বাঞ্ছা করি নরে,
না চাহি অমরে;-
নল মম হৃদয়ের রাজা'(১/২)

স্বয়ম্বর সভায় দেবতারা নলের সম-রূপ ধারণ করে দময়ন্তীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দময়ন্তী দেবতাদের স্তুতিবদে সন্তুষ্ট করেন। দেবতারা তাঁর অবিচল পতিভক্তিতে প্রীত হয়ে প্রত্যেকে স্বরূপ ব্যক্ত করেন এবং নলকে বর প্রদান করেন। লক্ষণীয় প্রেমের মর্যাদা দানে উত্তীর্ণ হলেন দময়ন্তী অথচ দেবতারা বর দান করলেন নলরাজাকে। নল দেবকার্য সাধনের জন্য ত্যাগের পথ অবলম্বন করেছেন অন্যদিকে দময়ন্তী দৈব প্রলোভনে নিজের কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে দেবতাদের জয় করেছেন। আবার দময়ন্তী দেবতাদের গ্রহণ না করায় শনির কোপ দৃষ্টিতে পড়েছেন।

''বৈদভীর মনোভাব জানি দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন।।
অনিমেষ-নয়ন স্বেদাম্বুহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে নাহি অঙ্গচ্ছায়া।।''[২১]

নিরাপরাধ মানুষের উপরও কখনো কখনো নেমে আসে দৈব বিড়ম্বনা। নল-দময়ন্তীর প্রতি ঈর্ষাকাতর কলির অশুভ প্রভাব তাদের সুখী দাম্পত্যকে বিচ্ছিন্ন করে। কলি নলের ছিদ্রান্বেষণে ব্যাস্ত হয়ে পড়েন। ''দেব-স্বামী ত্যজি দুষ্টা বরে নর ছার।।/ এই হেতু দন্ড আমি করিব তাহারে।''[২২] কলি নলের ভাই পুষ্করকে রাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে মায়াবী পাশা খেলায় নলের রাজ্য জয়ের ইন্দন যুগিয়ে সফল হন। কূট উদ্দেশ্য সফলের জন্য পুষ্করের আপাত ভদ্রতা বিদূষকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

বিদূষক : ইস্! বিষম গ্রহের কোপ! মহাশয়, আহার দিতে চান, বন্ধু বলে ডাকছেন–
শনির দৃষ্টি নিশ্চয় লেগেছে! নইলে অকস্মাৎ মহাশয়ের এত প্রেম কেন? (২/১)

বিদূষক চরিত্রের অবকাশ মহাকাব্যের আখ্যানে নেই। তবে কাহিনির শেষাংশে বার্তাবাহক ব্রাহ্মণের ভূমিকা নাটকে বিদূষকের দ্বারা প্রতিপূরণ হয়েছে। তাঁর শ্লেষ ব্যঙ্গ হাস্যরসের অন্তরালে কতগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রকৃত বাস্তবকে চিহ্নিত করে।

মায়া-অক্ষে পরাজিত নল সমস্ত রাজৈশ্বর্য হেরে গেলে পুষ্কর দময়ন্তীকে বাজি রাখার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে নাটকে নলের প্রতিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত জীবন্ত। আক্রমণোদ্যত নলের গর্জন - 'আরে নরাধম! প্রাণে নাহি কর ডর?'(২/২)

কাশীরাম :

''অবশেষে তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার।।
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত-লোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি বিষন্নবদন।।''[২৩]

রাজ্যহারা নলের সম্পর্কে নাগরিকদের প্রতি পুষ্করের নিষেধাজ্ঞা এবং জনসাধারণের মনোভাব প্রকাশের সুযোগ থাকলেও নাটকে নাগরিক চরিত্র নেই।

কাশীরাম :

''নল রাজ যাইবেক সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার।।
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে-রাজ্যে জানাইল চর।
রাজাজ্ঞা শুনিয়া সবে হৃদে পায় ডর।
তিন দিন ছিল নল নগর-ভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর।।''[২৪]

বনবাসী নলের পুনরায় রাজ্য লাভের সম্ভাবনা নেই, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি দময়ন্তীকে বিদর্ভ নগরে তাঁর পিতার কাছে ফিরে যেতে বলেন। নির্জন বনে দময়ন্তীকে একা ফেলে নল পালিয়ে যান। সকলই কলির চক্রান্ত বলে মনে হলেও, নল প্রকৃত প্রেমিক নন। বনের মধ্যে একাকিনী দময়ন্তীর পর ব্যাধের প্রলুব্ধ লালসা ও পরিনামে ভস্ম হওয়ার কাহিনি নাটকে বর্জিত হয়েছে। অনিশ্চয়তার মধ্যে কেবল মুনি আশ্বাস দেন –

''পাইবে স্বামীরে পুনঃ পাবে রাজ্যভার।
পুত্রকন্যাসহ সুখে বঞ্চিবে অপার।।''[২৫]

নাটকে দময়ন্তী আশাবাদী –

'প্রাণেশ্বর! নিশ্চয় বলে হে প্রাণ,
পাব পুনঃ দরশন।
তবে কেন করেছ অন্তর,
অন্তরের অন্তর আমার?'(৩/৫)

অপরদিকে নল নিস্ক্রিয়, কেবল দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ম্বরের কথায় তাঁর হৃদয় নড়ে ওঠে। বিচ্ছেদ তাঁর সহনীয় কিন্তু স্ত্রী অন্যপুরুষকে বরণ করে নেবেন তা তিনি মানতে পারেন না। পুরুষের চরিত্র সম্পর্কে দময়ন্তীর সখী নলকে অভিযুক্ত করেন –

'কঠিন পুরুষ জাতি
অনায়াসে ভার্য্যা ত্যাগ করে;
. . . আত্ম-বিসর্জ্জন পুরুষ শিখে না কভু।'(৪/৫)

নলের অন্বেষণে চেদিরাজ্যে রাজমাতার নিকট সৈরিন্ধ্রী পরিচয়ে আশ্রয় লাভের ঘটনা পাণ্ডবদের বিরাট নগরে আশ্রয়ের কাহিনির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। দময়ন্তী শর্ত আরোপ করেছেন –

''পুরুষ-সহিত দেখা না হবে কখন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন।।
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট না পদে দিব কর।
রাজমাতা ব্রত মম কহি পূর্বাপর।।''[২৬]

ককোটক-নাগের দংশনে নলের বিরূপ আকার প্রাপ্তি পরিচয় আত্মগোপনে সহায়ক হয়ে কাহিনিকে জটিল করেছে। নাটকে ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণ পৌরাণিক আখ্যানে বরাবর দেখা যায়। অর্জুনের বৃহন্নলা রূপ বা নলের বিকৃতাকার -এ রকম বহু উদাহরণ পোরাণিক কাহিনিতে যথেষ্ট পরিমানে রয়েছে। ঋতুপর্ণ রাজার কাছে নলের মহামন্ত্র দীক্ষার ফলে কলির প্রভাব মুক্ত হওয়ার ঘটনা মহাকাব্যে সমাধানের পথ দেখিয়েছে।

''মহামন্ত্র-দীক্ষা যদি লইলেন নল।
শরীরে আছিল কলি হইল বিকল।।
একে কর্কটের বিষে জর-জর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে।।
সেইক্ষণে অঙ্গ হতে হইল বাহির।
মুখেতে গরল বহে, কম্পিত শরীর।।''[২৭]

মহামন্ত্রের প্রভাবে কলির নিস্ক্রমণ হয়, সে অনুতপ্ত তাঁর কৃতকর্মের জন্য। নলের যন্ত্রণার চাইতে কলির যন্ত্রণা বেশি। ঈর্ষাকাতর ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেও তার মনে কখনোই শান্তি থাকে না। কলিকে শাস্তি দেওয়ার মতো কেউ নেই তথাপি কলি বিরুদ্ধ শক্তির প্রয়োগে ক্লান্ত। অপরদিকে নলের চরিত্রের কোনো বিকার নেই। এতকিছুর পরও নলের পাশা খেলার প্রতি বিরূপ মনোভাব হয়নি। 'যুদ্ধ কিংবা পাশাক্রীড়া যেবা তব মন/ করহ পুষ্কর ত্বরা।'(৪/৫) দময়ন্তী পাশা খেলায় মত্ত নলকে বিরত হতে বলেছেন কিন্তু সর্বগ্রাসী পরিণামের জন্য তিনি নলের প্রতি অনুযোগ করেন নি।

সংস্কৃত নাটকের বিদূষক ঔদরিক, ভীরু, কৌতুকরসস্রষ্টা চরিত্র রূপেই পরিচিত। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বিদূষক লোভীমাত্র নয়, সে প্রকৃত রাজভক্ত, নল-দময়ন্তীর সুখ-দুঃখের সঙ্গী। দেবতাদের থেকে প্রাপ্ত বরগুলি নলরাজাকে সনাক্ত করতে সহায়তা করে। খল চরিত্র কলি বিরুদ্ধ নিয়তি রূপে নলের জীবনকে নিয়ে পিশাচের মতো ক্রীড়ারত। তাকে কখনও মহাভারতের শকুনি চরিত্রের সগোত্র বলে মনে হয়। কলি তাড়িত নল ও দময়ন্তীর নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয় ও পরিশেষে বেদনার অশ্রুজলে প্রশান্ত মিলন পুরাণকাহিনি অবলম্বন করলেও এ নাটকে ভক্তিবাদ প্রচারের আবকাশ নেই। নল-দময়ন্তীর জীবন-নাট্য বিচিত্র ঘটনাসংঘাতে আকর্ষণীয়।

প্রহ্লাদ চরিত্র (১৮৮৪)

মহাভারতের বনপর্বে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও তার হরিভক্ত পুত্র প্রহ্লাদের কাহিনি অবলম্বনে গিরিশচন্দ্রের নাটক 'প্রহ্লাদ চরিত্র'। বরাহ অবতারের হস্তে অগ্রজ হিরণ্যাক্ষের নিধনের ফলে শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হিরণ্যকশিপু ভক্ত প্রহ্লাদকে হত্যার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। দৈত্যরাজের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলন্ত, অথচ পুত্রস্নেহ বাৎসল্য তার মনকে আর্দ্র করে। নাটকের নাম 'প্রহ্লাদ চরিত্র' কিন্তু প্রহ্লাদের চেয়ে হিরণ্যকশিপু চরিত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রহ্লাদের একরৈখিক হরিভক্তিতে হরি সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা নেই বলে চরিত্রটি হয়েছে সরল। ক্রোধোন্মত্ত দৈত্যরাজের মনে যে বিকার নাটকে দেখানো হয়েছে তা গৈরিশপ্রতিভার পরিচয় বহন করে।

নারদের কাছ থেকে হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু সংবাদে হিরণ্যকশিপু হরি বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন–

> ''দৈত্যপতি বলে মোর খণ্ডিল বিস্ময়।
> বিষ্ণু সে আমার শত্রু জানিনু নিশ্চয়।।''[২৮]

হরির সাক্ষাৎলাভের উপায় রূপে ভক্তের পীড়নের কথা নারদ বলেছেন, 'ভক্তের রক্ষণে আপনি আসিবে হরি'। (১/১) মহাভারতে নারদ ভক্ত পীড়নের কথা বললেও শত্রুরূপে ভজনার উল্লেখ রয়েছে।

> ''মোর মিত্রভাবে জন্ম ধর গিয়া যদি।
> ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি।।
> শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
> গর্ভের যন্ত্রণা মাত্র তিন জন্ম সার।।''[২৯]

মহাভারতের বিষ্ণু তথা হরিভক্তি নাটকে কৃষ্ণভক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বৈষ্ণবীয় ধ্যানধারণায় পৌরাণিক বিষ্ণুর পরিবর্তে যেভাবে ভাগ্বদীয় কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে নাট্যকারের মননে তারই ছায়াপাত দেখা যায়।

এক্ষেত্রে কাশীরামও কৃষ্ণ প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি –

''তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত কারো নাহি দায়।।''[৩০]

নাটকটি রচনার সমকালে রামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের প্রভাব প্রহ্লাদের ভক্তিভাবের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার হিরণ্যকশিপুর হরি অন্বেষণের মধ্যেও নেতিবাচকদিক থেকে শত্রুরূপে ভজনার ব্যকুলতাও প্রচ্ছন্নভক্তির নিদর্শন– 'দে রে দরশন, দরশন দে রে দুরাশয়।'(১/৭)

বালক প্রহ্লাদকে দৈত্যকুলোচিত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে আচার্য নিয়োগের উল্লেখ মহাকাব্যেই রয়েছে। নাট্যকার ষন্ড ও অমার্ক নামে দুইজন দৈত্যগুরু নিয়োগ করেছেন। তারা দৈত্যরাজের ভয়ে সংকুচিত - 'মহারাজ উভে উভে দেবে শূলে,/ হায় হায় পালাব কোথায়?'(১/২) কিন্তু মহাভারতে ব্রাহ্মণ গুরু প্রহ্লাদের অভিব্যক্তি দৈত্যরাজ সম্মুখে অকপটে উচ্চারণ করেছেন। নাটকে হিরণ্যকশিপুকে শিবের ভক্তরূপে দেখানো হয়েছে, 'হা শঙ্কর! হরিভক্ত নন্দন আমার,/ এই হেতু এতদিন পূজিনু তোমায়?'(১/৪) আবার শিবের কাছ থেকে বর– 'অস্ত্রে জলে অনলে নাহিক মৃত্যু'(২/৫) কাশীরামের আখ্যানে নেই, তবে শিবানুগত্যের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রহ্লাদের ভক্তি উন্মত্ততা অপ্রতিরোধ্য জেনে দৈত্যরাজ বলেছেন–

''নিতান্ত যদ্যপি তোর আছে ইষ্টে মন।
করহ শিবের সেবা করিয়া যতন।।''[৩১]

শিবের বরে দর্পী দৈত্যরাজ নৃসিংহের হাতে মৃত্যুকালে বরের মধ্যে ফাঁকটুকু দেখতে পেয়ে শিবকে প্রতারক বললেন এবং হরিকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন। হর-হরির অভেদ দৈত্যরাজ মেনে নিতে পারেন নি। নৃসিংহের সংলাপে শিবের থেকে প্রাপ্ত বরের রন্ধ্র স্পষ্ট হয়- 'সান্ধ্যাকাল, নহে দিবানিশি,/ নহে জলে-স্থলে–জানুপরে ত্যজ প্রাণ।' (২/৭)

পুত্রকে বারেবারে হত্যার চেষ্টা করেও বিফল দৈত্যরাজ কখনো পুত্রগর্বে গর্বিত হয়েছেন, 'দেখ পুত্র মম আমা হতে বীর'(১/৪) আবার আত্মসমালোচনা করেছেন, 'অভাগা কে আছে সংসারে,/ বধ করে আপন কুমারে?'(১/৪) পুনরায় আপন বংশের মর্যাদা বোঝাতে গৌরব ইতিহাস ব্যক্ত করেন। পুত্রের মৃত্যু তার কাম্য নয় কখনোই, তিনি চাইছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হান্তরক হরির নিধন। তাই বারবার প্রহ্লাদকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন –

'এখনও রে মার্জনা করিব তোরে,
বল হরি অরি
ইষ্টদেব শঙ্করে প্রনাম কর।(১/৫)

কাশীরাম : ''যত অস্ত্র প্রহারিল যত দৈত্যগণে।
হস্তিদন্ত ঠেকি দেহে ভাঙ্গে ততক্ষণে।।
শীতল হইল অগ্নি দেখিলে পরীক্ষা।
পড়িনু পর্বত হতে তাহে পেনু রক্ষা।।
মহামত্ত মল্লগণ লহ হীনদর্প।
আরো জান বিষহীন হৈল কালসর্প।।
প্রমাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
সমুদ্রে ফেলিতে তবে শিলা বান্ধি গলে।।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে ভাসিল পাষাণ।
তথাচ নহিল দূর তোমার অজ্ঞান।।''[৩২]

মহাভারতে হরিকে নৃসিংহ অবতার রূপে দেখার পূর্ব পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য ছিলেন, কিন্তু নাটকে কয়েকটি দৃশ্যে দেখা যায়- হাতীর পিঠে আরূঢ়, প্রজ্জলিত আগুনে, সমুদ্রবক্ষে প্রহ্লাদকে রক্ষা করতে তিনি সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন। প্রাণত্যাগের ভয় প্রহ্লাদের বিন্দুমাত্র নেই, শুধু কৃষ্ণ দর্শনাকাঙ্ক্ষা–

'দেখা দাও মদনমোহন আসি,
এস এস ভীতজন সখা!
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও সম্মুখে,
পুলকে অনলে ত্যজি প্রাণ'(২/৪)

মহাকাব্যে মদমত্ত হস্তী প্রহ্লাদকে আক্রমণ করে নিজের দাঁত ভেঙে ফেলেছে। নাটকে দেখা যায় হাতী প্রহ্লাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে দৈত্যানুচরদের প্রাণপাত করছে। হিরণ্যকশিপুর মহিষী কয়াধূ মহাকাব্যে নেই। গিরিশচন্দ্র হিরণ্যকশিপুর অন্তকরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজন্তপুরের একটি দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গদ্য সংলাপে বিকারগ্রস্ত দৈত্যরাজ স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করছেন, 'তুই পাপিনী নীচ-কুলোদ্ভবা! নচেৎ এমন নীচ সন্তান কেন প্রসব করলি? তোর সন্তান আমায় দিবানিশি তুষানলে দগ্ধ করছে।' মহাভারত বহির্ভূত দৈত্যরাজের বিকারগ্রস্ত আচরণ নাট্যকারের মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহন করে। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিক উন্মোচন করতে এই নাট্যদৃশ্যের প্রয়োজন রয়েছে। মহাকাব্যিক ঔদার্যতায় যা উপেক্ষিত; পিতৃসত্তা, ভাতৃপ্রেম ও আত্মহংকারের ঘুর্ণিপাকে তা মানব হৃদয়ে আন্দোলন সৃষ্টিকরে। মহাকাব্যের দানব-হৃদয় মানব-হৃদয়ে পরিণত হয়েছে। পুত্রের প্রতি স্নেহবশতই তিনি নিজহস্তে প্রহ্লাদকে হত্যা করতে পারেন না। নিদ্রিত অবস্থায় চিৎকার, ঘুমের মধ্যে পদচারণা, গদাঘাতে বাগান ছিন্নভিন্ন করা প্রভৃতি তার অন্তকরণেরই বহিঃপ্রকাশ। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কেবল হরিবিদ্বেষী নয়, তার অন্তরে পুত্রস্নেহের দিকটিও নাটকে উন্মোচিত হয়েছে।

শ্রীবৎস-চিন্তা (১৮৮৪) :

শ্রীবৎস-চিন্তা উপাখ্যানের স্রষ্টা কাশীরাম দাস। মূল মহাভারতে এ আখ্যান না থাকলেও সাধারণ বাঙালি মহাভারত বলতে কশীরামের আখ্যানকেই বুঝে থাকে এবং নাট্যকারেরা তাঁর কাহিনিই অনুসরণ করেছেন। ধন-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী ও অশুভ দৃষ্টি সম্পন্ন শনি দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যদিয়ে নাটকের সূত্রপাত কাশীরামের অনুসারী হলেও গিরিশচন্দ্র ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় নিস্পেষিত মানুষের যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন। ধনসম্পদই জগতের সকল অশান্তির মূল বলে শনি লক্ষ্মীকে ব্যঙ্গ করেছেন। কাশীরামের আখ্যানের নিছক দৈব কলহ নাটকে আরো এক মাত্রা সংযোজন করে।

বণিক সভ্যতায় শ্রম ও উপার্জনের অসামঞ্জস্যের ফলে সৃষ্ট সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিবারণের জন্য মন্ত্রী রাজার কছে রাজ্যের বর্তমান অবস্থা ব্যক্ত করেন। রাজকোষ থেকে অর্থ বিতরণে সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি হলেও মূল সমস্যার সমাধান হবে না। শ্রীবৎস বণিকের প্রতি নিষেধাজ্ঞা করার বিধান খুঁজে পান না, 'কি বিচারে, বণিকেরে করিব বারণ?'(১/২)

দীন-হীনের প্রতি শ্রীবৎসের অন্তরে সমবেদনা থাকলেও বাতুল অন্যায় অত্যাচারে রাজার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন। অনাহারী বাতুলের রাজানুগ্রহে অবহেলা ধনতান্ত্রীক সভ্যতার প্রতি এক তীব্র ব্যঙ্গ। নাটকে বাতুল অত্যাচারিত প্রবঞ্চিত সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। কাশীরামের আখ্যানের মধ্যে ধনতন্ত্রের সমালোচনা নেই। লক্ষ্মী ও শনির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে স্বর্ণ ও রৌপ্য সিংহাসন নির্মাণের বুদ্ধি নাটকে দৈব্যবাণী থেকে প্রাপ্ত। লক্ষ্মী স্বয়ং চিন্তাদেবীকে এ পরামর্শ দিয়েছেন –

'দেখ্‌ব কেমন আদর তোমার,
সিংহাসন দিস্‌ মা সোণার,
আর যে আসে বোস্‌বে এসে–
রূপোর খানা রইল তারি।'(১/৩)

ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীর বার্তা বণিক সভ্যতার গোপন ষড়যন্ত্রের মতো রাজমহিষী চিন্তার নিকট ব্যক্ত হয়েছে। কাশীরামে বিচারের স্বচ্ছতা নাটকে পক্ষপাত দুষ্ট। বিচারের পন্থা নির্ণয়ে চিন্তার ভূমিকা কাশীরামে নেই। লক্ষ্মী ও শনিকে নিয়ে দ্বিপাক্ষীক আলোচনার অবকাশ নাটকে থাকলেও আখ্যানে সে সুযোগ নেই। শ্রীবৎস আত্মদোষ মুক্ত হওয়ার জন্য মন্ত্রণা করে বিচারের উপায় নির্ধারণ করেছেন–

''আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত একরৌপ্য বিরচিত,
দুই পার্শ্বে দুয়ের স্থাপন।।''[৩৩]

নাটকে লক্ষ্মী ও শনির বিচারের পূর্বে শ্রীবৎসের বিনিদ্র রাত্রির যন্ত্রনা রাজা ও বাতুলকে সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে। বাতুল তার জীবনের সংক্ষিপ্ত সার রাজার কাছে প্রকাশ করেছেন -

> 'জল হলো না, খাজনা দিতে পারলেম না–বর ছেলেটার বুক ডলে মেরে ফেল্লে, আর আমায় জেলে দিলে, মাগীটাকে টেনে নিয়ে গেল, ছেলেগুলোও অন্নাভাবে মারা গেল। জেলের পর ভিক্ষা, তার পর চুরি, তার পর ফের জেল।' (১/৫)

পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে সময় ও যুগ প্রভাবে নাটকে এভাবেই নতুন চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। লক্ষ্মী ও শনি উভয়কেই অপমান করবার বাতুল-বুদ্ধি ভীরু মনে ঠাঁই পায় না। নাটকে বামদিকের সিংহাসনে লক্ষ্মীর বসা ন্যায় সঙ্গত নয় বিবেচনা করে শনি নিজেই বামদিকের সিংহাসনে বসেছেন। কাশীরাম সরল ভাবে দক্ষিণে শ্রেষ্ঠ আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নাটকে শনি ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে প্রজাদের রাজ্য বিনষ্ট করার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। একমাত্র বাতুল ছাড়া সকলেই শনির কথায় উৎসাহিত হয়ে রাজ্যনাশে উন্মত্ত হয়। শনির সংলাপ-

> 'আরে তোরা কেন বসে–যা, ধানের গোলা লুট্ কোরগে। হৈ হৈ শব্দ শুনছিস্? উত্তরপাড়ায় লোক সব লুটে নিলে। দেখ্, দেখ্, তোফা আগুন জ্বেলে দিয়েছে–যা, লুট কর, ঘর জ্বালিয়ে দে, বড় লোকের সর্ব্বনাশ কর, নৈলে আর উপায় নাই–যা, মার্ কাট্ লুট্ কর।'(২/১)

দ্বিতীয় অঙ্কে প্রজাদের বিদ্রোহ, কোটালের প্রাণনাশ ও রাজাকে নিধনের প্রচেষ্টায় পীড়িত জনসাধারণের বিক্ষোভে শ্রীবৎসের পলায়ন –ইত্যাদি প্রসঙ্গ নাটককে ভিন্নমাত্রা দান করে। মায়া-নদী পারাপারে ছলনা করে কাঁথা নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে নাটকে দুঃখের মধ্যেও শনির রসিকতা–

> 'খেয়ে খেয়ে গোমড়া-গোমড়া হয়ে আস্বে, আর বল, পার কর। যাও, এখন ঘরে বসে ছ'মাস শুকোওগে, বিশ তিরিশ সের মাংস না কম্লে আমি পার কত্তে পারবো না।'(২/৭)

কাশীরামে শনি জেরা শুরু করেছে -

''নাবিক আসিয়া কহে, তুমি কোন্ জন।
রমণী-সহিত রাত্রে কোথায় গমন।।
হরিয়া কাহার নারী কোথা নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ আগে, কূলেতে দাঁড়াও।।''[৩৪]

লক্ষ্মীদেবী মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে চিন্তার নিকট এসে সান্তনা ও দিক্‌নির্দেশ করে যান। আমৃত দান করেন, শ্রীবৎসের সংবাদ জানিয়ে যান।

'প্রাণ আমার কেমন করে,
নিত্য তোরে দেখতে আসি,
তুমি যাও জলে ভেসে,
নয়ন জলে আমি ভাসি।'(৪/১)

অনাহারে শ্রীবৎস অনুধাবন করতে পারেন ক্ষুধার্ত প্রজাদের যন্ত্রণা। ধীবর ও কাঠুরিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্মতার মধ্যদিয়ে রাজতন্ত্রের পতনের চিত্র পৌরাণিক কাহিনিকে যুগের প্রাসঙ্গিক করে তোলে। বণিকের নৌকো চরায় ঠেকে গেলে গণকবেশী শনির পরামর্শে কাঠুরিয়া বৌদের শাড়ি বিতরণের পরও নৌকা না ভাসলে বণিক শনিকে রসাল মন্তব্য করেন–

'তোমার কথায় বস্তা বস্তা শাড়ী বিলালুম, আর নৌকা কেবল ভুস্ ভুস্ বসে যাচ্ছে! বলি ও শুক্‌নো কাঠের নৌকা,–তোমার মতন তো তেমন রস নাই যে, মেয়ে মানুষ ছুঁলেই গা সেওরাবে–ভেসে যাবে।'(৩/২)

শনির পরামর্শে চিন্তাকে অনুনয় করে নৌকাস্পর্শে সম্মত করে তার দ্বারা বিপদ মুক্ত হওয়ার পরই চিন্তাকে জোরপূর্বক নৌকায় তুলে নেয়ার কাহিনি কাশীরামের অনুরূপ।

''জানিল মনুষ্য নহে এই নারীজন।।
যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে।।
এত ভাবি নৌকাপরে লইল চিন্তারে।''[৩৫]

বাহুদেব রাজার কন্যা ভদ্রার সঙ্গে শ্রীবৎসের বিবাহের ঘটকালি করে লক্ষ্মী স্বয়ং মালিনীর ঘরে আশ্রীত শ্রীবৎস রাজার সন্ধান বলে দেন। কাশীরামে ভদ্রা বর চেয়ে নিয়েছিলেন -

''বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস-নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে।।''[৩৬]

স্বয়ংবরে অন্যান্য রাজাকে অবহেলা করে শ্রীবৎসকে বরণ করে নেয়ার ফলে ভদ্রার পিতার বিপরীত প্রতিক্রিয়া–

''হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক-মুণ্ডন।।
ভদ্রাকন্যা-মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিল মোর অন্তপুর সার।।
এত কাল ভগবতী করি আরাধন।
কুজাত-কুরূপ বরে বরিল এখন।।''[৩৭]

নাটকে স্বয়ংবরের পূর্বেই লক্ষ্মীর সহায়তায় শ্রীবৎস ও ভদ্রা পরস্পর পরস্পরকে বরণ করে নিয়েছেন। ফলে বাহুরাজের প্রতিক্রিয়া আরো তীব্রতর। তিনি তাদেরকে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দান করেন। কাশীরাম তাদের কারারুদ্ধ করেন নি।

চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মী বাতুল ও শনির সংলাপে রাজনৈতিক অবস্থার সমালোচনা নাট্যকারের মৌলিক ভাবনা। শ্রীবৎসের অনুপস্থিতিতে অরাজক পরিস্থিতি লক্ষ্মীর সংলাপে ধরা পড়ে-

'এবে মন্ত্রী ভাবে রাজা হবে,
সেনাপতি ভাবে সেই মত,
বণিক সকল,
অর্থ-বলে করিতেছে বাহিনী সংগ্রহ,
ভাবে রাজকার্য্য করিবে একত্রে মিলি;
শ্রীবৎসের কেহ না উদ্দ্যেশ করে।'(৪/৩)

শ্রীবৎসের কাছ থেকে যে বণিক সোনার ইট প্রতারণা করে নিয়েছিলেন তাকে খুঁজে পেয়েছে বাতুল। রাজকন্যা লাভের প্রলোভন দেখিয়ে সে বণিকে করায়ত্ত করে। কাশীরামে শ্রীবৎস

বণিকের নৌকা নিজেই আটক করে, সেখানে বাতুল নেই। বাহুরাজের সম্মুখে শ্রীবৎসের আপন পরিচয় দান ও চিন্তাকে পুনরায় প্রাপ্তিতে নাটকে বাতুলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শ্রীবৎসের দীর্ঘ দিনের ভোগান্তি নাটকে শুধু দৈব বিড়ম্বনা বলে ব্যাখ্যাত হয় না।

'শিক্ষা মম ছিল বাকি,
দরিদ্রের দীনতা বুঝেছি এত দিনে।'(৪/৮)

পুরাণ কাহিনির মধ্যে ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বণিক সভ্যতার প্রক্ষেপন গিরিশচন্দ্রের নাটকে নতুনমাত্রা সংযোজন করেছে। লক্ষ্মী ও শনির পরস্পর সংঘাত, শ্রীবৎসের জীবনের উত্থান-পতন, প্রজাদের বিক্ষোভ ইত্যাদি বিষয়ে নাটকের কাহিনি কেবল পুরাণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নি। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য পৌরাণিক নাটকের মতো এ নাটকেও প্রচলিত কাহিনির মধ্যে আধুনিকতার ছায়াপাত ঘটেছে।

জনা (১৮৯৪) :

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে জনা চরিত্রটি মদুসূদন দত্ত ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ দুই মহারথীর জন্যই যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে একথা বলাই বাহুল্য। কে এই জনা? বেদব্যাসের মহাকাব্যে তার উল্লেখ নেই। জৈমিনির ভারত সংহিতায় জ্বালা নাম্নী যে উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে তাকেই বঙ্গকবি কাশীরাম জনায় রূপান্তর করেছেন। কাশীরাম কিংবা কৃত্তিবাস ব্যাস-বাল্মীকির অনুবাদ করতে গিয়ে যদি কেবল সংস্কৃতের দাসত্বই করতেন তাহলে তাঁদের পাঁচলি বাঙালির ঘরে ঘরে শোভা পেত না। সাধারণ বাঙালি রামায়ণ-মহাভারত বলতে কৃত্তিবাস-কাশীরামের আখ্যানকেই বুঝে থাকে। বাংলা সাহিত্যের কবি-নাট্যকারেরা মূলত তাঁদেরকেই অনুসরণ করেছেন। একটি পৌরাণিক আখ্যান বা চরিত্র কালের বিবর্তনে বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকদের কলমে ক্রমবিকশিত হয়ে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্মদেয় তাতে একদিকে যেমন সমকালীন পাঠক-দর্শক তৃপ্তি পায়, আবার ভবিষ্যকালের নতুন সাহিত্য সৃজনের দ্বার উন্মোচন করে দেয়।

কাশীরাম জৈমিনি ভারত অনুসরণ করলেও কিছু পরিবর্তন খুব স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। জ্বালা-জনা বা উল্মুক-উলুক এই নামের পার্থক্যই শুধু নয় গঙ্গার সঙ্গে জনার মা সম্পর্ক স্থাপন কাশীরামের হাতেই ঘটেছে। গঙ্গাজলের স্পর্শে পাপ সঞ্চারের কষ্ট কল্পিত আখ্যান জৈমিনি ব্যাখ্যা করতে পারলেও পবিত্র গঙ্গাকে কাশীরাম মা ব্যতীত অন্যকিছু ভাবতে পারেন না। জৈমিনি আখ্যানে জনা অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে ভয়ঙ্কর বাণরূপে আবির্ভূত হয়ে অর্জুন নিধনের জন্য বভ্রুবাহনের বাণের মধ্যে প্রবেশ করেন। কাশীরামে জনা নিজের দুঃখের কথা গঙ্গা দেবীর কাছে ব্যক্ত করে অনন্ত সলিলে সমাহিত হন।

''এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল।
পুত্রশোক পেয়ে জনা শরীর ত্যজিল।।
জনার মরণে শোক পেয়ে ভাগীরথী।
ক্রোধে অভিশাপ দিল অর্জুনের প্রতি।।''[৩৮]

মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে পাণ্ডবদের যজ্ঞাশ্বটি মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হলে নীলধ্বজপুত্র প্রবীর সেই অশ্বটিকে বন্ধন করেন। অশ্ব প্রত্যার্পণ না করায় কৃষ্ণার্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবীবের মৃত্যু হলে নীলধ্বজ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করেন। প্রবীরের মাতা জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হয়ে স্বামীর প্রতি ধিক্কার ও পুত্রহন্তারকদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নীলধ্বজকে উদ্দীপিত করতে সচেষ্ট হন। মহাভারতে ক্ষত্রিয় নারী জনা মাতৃত্বের স্বাভাবিক প্রবণতাতেই পুত্রঘাতকের সঙ্গে আপোশ করতে পারেন না।

''জনা বলে কি কথা কহিলে নরপতি।
শত্রু সঙ্গে কেমনেতে করিব পীরিতি।।
প্রবীরে মারিয়া পার্থ হৈল মোর অরি।
তার সঙ্গে প্রীতি কর সহিতে না পারি।।''[৩৯]

মধুসূদনের জনা ক্ষাত্রতেজের সঙ্গে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অভিমান ও শত্রু পক্ষের নিন্দায় মুখরিত। আবার নীলধ্বজ যে ভয়ে শত্রুপক্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছেন গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে সেই ভয়কে অতিক্রম করে নরনারায়ণ দর্শনের ইচ্ছায় ভক্তিরসের স্রোতে প্লাবিত করেছেন।

মধুসূদনের কাব্যে জনার পুত্রশোক অপেক্ষা নীলধ্বজের বিসদৃশ আচরণই তাকে ব্যথিত করে তুলেছে। বীরপুত্র সম্মুখযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে বলে ক্ষত্রিয় নারী জনা কেবল শোকে নিমগ্ন না হয়ে স্বামীকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন।

''সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।''[৪০]

অর্জুনের পদ সেবায় বিনীত নীলধ্বজের প্রতি ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় জনা বিস্ফারিত হয়ে পাণ্ডব বংশের অপকীর্তি ঘোষণা করতে থাকেন তীব্র ব্যঙ্গে। মহাভারতের সভাপর্বে কৃষ্ণ নিন্দায় শিশুপাল যেমন মুখরিত হয়ে ওঠেন তেমনি জনা অর্জুনের অন্যায় যুদ্ধ, কুন্তী-দ্রৌপদীর ভ্রষ্ট চরিত্র ও ব্যাসদেবের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিতে মুখরা হয়ে ওঠেন।

''ভোজবালা কুন্তী–কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জুনে''[৪১]

দ্রৌপদী সম্পর্কে –

''দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ!''[৪২]

নারী চরিত্রের এই দিকটি মধুকবির সংযোজন। কাশীরামের জনা কটূবাক্য জানেন না, তার কণ্ঠস্বর কেমন নিরুত্তাপ শোনায় –

''সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জুন নিধনে মোর শোক নিবারণ।।''[৪৩]

নীলধ্বজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জনা ভাই উলুকের সাহায্যে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার প্রয়াস পর্যন্ত কাহিনিকে প্রলম্বিত করেননি মধুসূদন। কেননা প্রতিশোধাকাঙ্খা মধুকবির অভিপ্রায় নয়, স্বামীর প্রতি তীব্র অভিমানে আত্মবিসর্জনের পূর্বে জনাহীন রাজপুরীর কথা ভেবে তার দীর্ঘ নিশ্বাস–

''ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, ''কোথা জনা'' বলি ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি ''কোথা জনা?'' বলি!''[৪৪]

গিরিশচন্দ্রের জনা নাটকের ঘটনা মহাভারতের হলেও এর উপস্থাপন উনিশশতকীয় বাঙালির ধর্মাবেগে জারিত। তাঁর জনা নাটকের অনুপ্রেরণায় মধুসূদনের কাব্যের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। নাট্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে সুগভীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

> ''মধুসূদনের জনা এবং দেবযানীর চরিত্রের সমবায়ে যেন গড়ে উঠেছে গিরিশচন্দ্রের প্রতিবাদিনী জনা। . . . গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকে জনা-র মতো একজন প্রতিবাদিনী নারী-চরিত্র সৃষ্টি করার পেছনে শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। মধুসূদনের কাব্যে-নাটকে নারী ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশ বার বার আমরা দেখেছি জনা নাটকে জনা চরিত্র সেই প্রকাশে বিশিষ্ট।''[৪৫]

কাশীরামের আখ্যানে প্রবীর চরিত্রে মাতৃভক্তির উল্লেখ নেই। কিন্তু জনা নাটকে প্রবীর চরিত্রের প্রধান শক্তি মাতৃভক্তি।

'ভক্তিভাবে মাতৃমন্ত্র জপিলে প্রবীর
শমনের অধিকার না রহিবে আর,
অসংশয় রাজপুত্র জিনিবে সমর।' (৩/৩)

নাটকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যথার্থ সখা না ভেবে দাস ভাবে নিবেদন করেছেন –

'তুমি প্রভু, দাস মোরা সবে।
চিন্তামণি সহায় যাহার
কিবা চিন্তা তার;
নিজ কার্য উদ্ধার কেশব।'(১/৪)

নাটকে কৃষ্ণার্জুনের সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই বলেছেন, ''ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবাদর্শেরই অনুকূল মহাভারতের পার্থসখার উপযুক্ত আচরণ নহে।''[৪৬] নীলধ্বজের কৃষ্ণভক্তি ও জনার গঙ্গাভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস কাশীরামের কাব্যে নেই। কাশীরামের কাব্যে নীলধ্বজের কৃষ্ণভক্তি ভয় থেকে জাত। নাট্যকার ভক্তির দ্বারা ভয়কে আড়াল করেছেন। নাটকে নীলধ্বজের অভিব্যক্তি–'সখা, সফল জীবন মম,/ পাব আজ কৃষ্ণ-দরশন।'

বিদূষকের ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারে কৃষ্ণস্তুতি বৈষ্ণবীয় ভক্তিতে সিক্ত। নাট্যকারের সৃষ্ট বিদূষক চরিত্রটি মহাভারতে তো নেই-ই, সংস্কৃত নাটকের লাড্ডুকপ্রিয় শৃঙ্গার-রসাত্মক বিদূষকের অনুসারীও নয়। মদনমঞ্জরী চরিত্রটি মহাকাব্যে নেই, নাট্যকার চিরন্তনী বাঙালি বধুর আদর্শে এই চরিত্রটি গড়ে তুলেছেন। নাটকের প্রয়োজনে সৃষ্ট অন্যান্য গৌণ চরিত্রগুলি গিরিশচন্দ্রের নাট্যবোধের ফসল।

মধুসূদনের জনা বিদ্রোহিণী নয়, পত্রকাব্যের উদ্দিষ্ট নায়ক স্বামী নীলধ্বজের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও অভিমানটুকুই সম্বল। আর গিরিশচন্দ্রের জনা কেবল তীব্রভাষায় স্বামীকে আঘাত করেনি, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি অলঙ্কারের সাহায্যে নীলধ্বজের ব্যক্তিত্বহীনতার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ প্রকাশ করেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণে জৈমিনি যে আখ্যানের সূত্রপাত করেছিলেন, কাশীরাম তাকে বাঙালি মানসের উপযোগী করে তুলেছিলেন। আবার আধুনিক কালের কবি জনার মধ্যে যে সনাতনী নারীর ব্যক্তিত্বকে আবিষ্কার করেন, নাট্যকার সেই নারীর ক্ষাত্রতেজের সঙ্গে ইউরোপীয় নারী ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান করেন। আর এভাবেই বিবর্তিত হয়ে চলে একটি পৌরাণিক চরিত্র। জনার মতো বহু পৌরাণিক নায়ক-নায়িকারা সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা করে থাকে জীর্ণ পুঁথির পাতায়। ভাবীকালের কোনো কবি এসে একদিন তাদের ঘুম থেকে টেনে তুলে আনবেন সাহিত্যের অঙ্গনে।

পাণ্ডব গৌরব (১৯০০) :

'পাণ্ডব গৌরব' নাটকের কাহিনি মহাভারত আখ্যানে নেই, কিন্তু দণ্ডী-উর্বশীর আখ্যানে ভীম, দুর্যোধন, কৃষ্ণ, দুর্বাসা প্রমুখ মহাভারতীয় চরিত্রগুলিকে যে ব্যতিক্রমী ভূমিকায় দেখা যায় গিরিশচন্দ্রের নাটকে তারই রূপায়ন ঘটেছে। তিনি মূলত উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'দণ্ডীপর্ব' (১৮৭০) -এর কাহিনি অনুসরণ করেছেন। এছাড়াও প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের 'দণ্ডীচরিত বা উর্বশীর অভিশাপ' (১৮৮৬) ও রোহিণীনন্দন সরকারের 'দণ্ডীপর্ব –মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত' (১৮৮৫) গ্রন্থ দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক অভিধানে দণ্ডী-উর্বশীর যে আখ্যান উল্লেখ রয়েছে-

> ''উর্বশী একবার অভিশপ্ত হয়ে যখন ঘোটকীতে পরিণত হয়, তখন রাজা দণ্ডী এই অশ্বরূপী অভিশপ্তা উর্বশীকে গ্রহণ করেন; কিন্তু কৃষ্ণ এই অশ্বাকে গ্রহণ করতে চাইলে দণ্ডী ঘোটকীকে দিতে অস্বীকৃত হন এবং কৃষ্ণের ভীতিতে ত্রিভুবন ভ্রমণ করেও সর্বত্র আশ্রয়লাভে বঞ্চিত হন। অবশেষে অন্যান্য ভ্রাতাদের অসম্মতিসত্ত্বেও ভীম দণ্ডীকে আশ্রয় দেন। এজন্য কৃষ্ণের সঙ্গে ভীম ও তাঁর অন্যান্য ভ্রাতাদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কৌরবেরা পাণ্ডবদের পক্ষ এবং দেবতারা কৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন। শেষে অশ্বরূপী উর্বশী শাপমুক্তা হয়ে স্বর্গে গমন করলে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। দণ্ডীও নিজের রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।''[৪৭]

স্বর্গবাসীদের মর্তে অবতরণের নেপথ্যে অভিশাপ বর্ষণের সাধারণ সূত্রধরেই আগমন ঘটেছে উর্বশীর। নাটকে দুর্বাসাকে শাপগ্রস্ত উর্বশীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও নিজের কোপনস্বভাবের জন্য নারদের কাছে আত্মসমালোচনা করতে দেখা যায়।

'শুন হে দেবর্ষি, কব অধিক কি আর,
ক্রোধ মাত্র লভিয়াছি তপস্যার ফলে।
কেন মোরে নিজ অংশে সৃজিল শঙ্কর,
চিরদিন বহিতে এ আনুতাপানল।
ক্রোধে যারে তারে দিই অভিশাপ,
অনুতাপে দহে শেষে প্রাণ!

হের মহাভাগ, ত্যজি যোগযাগ,

এসেছি কন্টকময় কানন মাঝারে–

উর্ব্বশীর যোগাতে আহার।'(১/১)

নাটকে উর্বসী আত্মপরিচয় দিয়ে দণ্ডীকে সাবধান করেছেন। স্বর্গ বেশ্যা পৌরাণিক উর্বসী কামনা থেকে বিরত থাকতে বলেন না বরং কামনার ফাঁদে আবদ্ধ করতেই চান। নাটকে মর্ত মানবীর প্রেমহীন দেহজ ভোগে ক্লান্ত স্বর –

'এত ছিল ভালে, নরে স্পর্শে অহর্নিশি!

স্পর্শ লাগে অঙ্গার সমান।

হায় হায়–প্রাণ নাহি যায়,

নারী হয়ে সহে আর কত!'(১/৩)

অশ্বে রূপান্তরের মধ্যে নিম্নস্তরের শরীরসর্বস্ব প্রাণীর রূপকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ। উর্বশীর রূপের মোহে অন্ধ দণ্ডী রাজ্যপাটের কথা না ভেবে সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছুটে গেলেও তার প্রেম রূপকে আতিক্রম করে দেহাতীত সৌন্দর্যকে স্পর্শ করতে পরে নি। পুরুষের প্রবৃত্তি সম্পর্কে জ্ঞাত উর্বশী তাই বারেবারে সতর্ক করে দেন।

'প্রেম-আশে লয়ে যাবে বাসে

প্রাণহীনা কামিনীরে?

ভোগতৃষা বাড়িবে কেবল–

নাহি হবে অন্তর শীতল।'(১/১)

আবার যে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই অর্জুনের ঘরনীর কাছে আশ্রয় লাভে উর্ব্বশীর গ্লানি-

'ছিঃ ছিঃ! এত কি লাঞ্ছনা ছিল ভালে!

যে অর্জুন আমারে ঠেলিল পায়,

তার প্রেয়সীর গৃহে আজ আমি দাসী!'(২/৩)

মহাভারতে উগ্রক্ষত্রিয়ের ধ্বজা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পায় নি। মহাযুদ্ধ অনিবার্য জেনেও মীমাংসার চেষ্টা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। নাটকে যাদবেন্দ্র যুদ্ধোন্মাদনায় সামান্য এক ঘোটকী প্রাপ্তির জন্য প্রবল পরাক্রম প্রকাশে অত্যুৎসাহী। অশ্ব ভুবনমোহিনী উর্বশী কিনা এ তথ্যে তাঁর প্রয়োজন নেই। নারদীয় ভাষ্যে উত্তেজিত শ্রীকৃষ্ণ যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কৃষ্ণ চরিত্রের সমালোচনায় উৎপল দত্ত লিখেছেন -

> ''পাণ্ডবগৌরবের সমাজ এক ভীষণ যুদ্ধবাজ সমাজ। সেখানে ক্ষত্রিয়রা কথায় কথায় নরহত্যার বন্যা বওয়ায়, এমন আবহাওয়া গোড়া থেকে সৃষ্ট। কৃষ্ণের এই স্বেচ্ছাচারী রাজার চেহারা সেখানে অতিশয় বাস্তব ও কালোপযোগী।''[৪৮]

মহাভারতে সুভদ্রার মানসিকতা দ্রৌপদীর দাসীত্ব বিনম্রভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত, তিনি অহংকারহীন। এমন কি পুত্র অভিমন্যুকে নিয়ে দ্রৌপদীর যে আস্ফালন তাও সুভদ্রার নেই। নাটকে কৃষ্ণভগ্নী সুভদ্রার দণ্ডীকে আশ্রয় দানের মধ্যেও তীব্রভাবে কাজ করেছে জাত্যাভিমান। যাদবনন্দিনী পাণ্ডুকুলনারী সুভদ্রা বলরামকে স্পর্ধিত স্বরে বলেছেন -

> ‘কাটি বেণী বিনাইব গুণ,
> অশ্ব রজ্জু করিব ধারণ পুনঃ,
> নারী হয়ে ধরিব ধনুক।’(২/৭)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিস্পর্ধী রূপে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা কোনো রাজাই দেখান নি। দুর্যোধন যাদবদের সঙ্গে সংঘর্ষ খুব সাবধানে এড়িয়ে গেছেন। এমনকি মাথামোটা ভীমও বিধ্বংসী যুদ্ধে বিপুল জনক্ষয়ের নিদারুণ পরিনতিকে সীমিত করতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাব দেন।

> ‘করিব কৃষ্ণের সহ দ্বৈরথ-সমর,
> পরাজয় করিয়ে আমারে
> তুরঙ্গিণী সনে দণ্ডী করুন গ্রহণ।’(২/৫)

কৃষ্ণের প্রতিপক্ষ রূপে ওরই ভগ্নি সুভদ্রাকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়। অন্যদিকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবতার প্রশ্নে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরের প্রতি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন রুক্মিণী।

‘কেহ যদি বল করি হরে কার ধন,
হও হরি তখনি তাহার অরি!
হীনমতি কেমনে হে বুঝিব চরিত?
বিপরীত-রীতি কিবা আজি,
অবন্তীর অশ্বিনী হরিতে কেন সাধ?’(১/৩)

মহাভারতে অজ্ঞাতবাসের শেষে যুদ্ধোদ্যোগের সমকাল নাট্য কাহিনির সময় কাল। কৌরবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আবহে ঘনীভূত পরিস্থিতিতে দ্রৌপদীর ক্ষাত্রতেজ নাটকে সংশয়ে সংকুচিত।

‘‘পিতা মম যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
ভাই আরো যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।।
শিখন্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চভাই যুঝিবেন রণে সাবধান।।
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব যুদ্ধে অভিমন্যুবীর।।’’[৪৯]

নাটকে দ্রৌপদীর সংলাপ :

‘একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরব সহায়,
তাহে নারায়ণী সেনা দেছেন শ্রীহরি,
সেও অক্ষৌহিণী একাদশ;
শুনি গুণমণি, কৃষ্ণ সম বীর জনে জনে।
না বুঝি কেমনে তবে হবে রণ-জয়!’(২/১)

মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে দন্ডীকে রক্ষার জন্য কৃষ্ণের বিরুদ্ধে পান্ডবদের যুদ্ধ জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। মহাভারতে পান্ডবের উত্থান শ্রীকৃষ্ণের পদাশ্রয় করেই সম্ভব হয়েছে। কৃষ্ণ বিরোধিতার মতো হঠকারি সিদ্ধান্ত পান্ডবের মনে বিন্দুমাত্র জায়গা করে নিতে পারে না। যাদবের সঙ্গে যুদ্ধে কৌরবগণের অবস্থান কোন পক্ষে হবে সে সমন্ধে দুর্যোধন দুঃশাসনকে সে কথাই বলেছেন বনপর্বে গন্ধর্বরাজের হাত থেকে রক্ষার জন্য যুধিষ্ঠির অনুজদের যা

বলেছিলেন, তারই প্রতিধ্বনি। দুর্যোধনের জ্ঞাতি টান প্রকাশ পেয়েছে -

'জেন বীর, পর সহ বাদে–
এক শত পঞ্চ ভাই মোরা;
জ্ঞাতি যুদ্ধে অন্য মত–
পঞ্চ জন তারা, মোরা শত সহোদর।'(৩/১)

ঈশ্বরের বিরুদ্ধ সংগ্রামে মানবতার বন্ধনের সূত্রে দুর্যোধন স্বজাতির প্রতি গভীর আত্মীয়তা বোধ করেছেন। এই নাটকের নায়ক ভীম, অর্জুনের কৌরব সভায় সাহায্যপ্রার্থী হয়ে গমন বা কর্ণকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য কুন্তীর তোষামোদ কোনটাই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেন নি। যুদ্ধের উন্মাদনায় প্রবল পরাক্রমশালী দুটি উগ্রক্ষত্রিয় গোষ্ঠী পরস্পকে বিনাশের সংকল্পে সামান্য এক ঘোটকীকে কেন্দ্র করে যে ধ্বংস যজ্ঞে মেতে উঠেছে গিরিশচন্দ্রের নাটকে তারই প্রতিরূপ চিত্রিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১.গিরিশচন্দ্র ঘোষ : গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী, (১ম খণ্ড), 'পৌরাণিক নাটক' পৃ: ৭৩২, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ,২০১২

২. গিরিশচন্দ্র ঘোষ : গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী, (৫ম খণ্ড), 'ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' পৃ: ২৬০, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১২

৩. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : 'গিরিশচন্দ্র', পৃ:২০, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১১

৪. উৎপল দত্ত : 'গিরিশ মানস', পৃ: ২৫০, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮

৫. ভারতী-মাঘ, ১২৮৮

৬. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী : 'মহাভারতের লঘুগুরু' পৃ:১৫৩, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২

৭. রাজশেখর বসু : 'মহাভারত' (সারানুবাদ), পৃ: ৪২০, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, ১৪১৮

৮. উৎপল দত্ত : 'গিরিশ মানস', পৃ: ২৩৭, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮

৯. উৎপল দত্ত : ঐ

১০. দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পা.) : গিরিশ রচনাবলী, (৩ম খণ্ড), ভূমিকা অংশ, পৃ: ১৪, সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১২

১১. উৎপল দত্ত : 'গিরিশ মানস', পৃ: ২৪১, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮

১২. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৫৫৪-৫৫৫, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

১৩. কাশীরাম দাস : ঐ, পৃ: ৫৬৩, ঐ

১৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড), পৃ:৩৯৯, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

১৫. উৎপল দত্ত : 'গিরিশ মানস', পৃ: ২৪৮, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮

১৬.কালীপ্রসন্ন সিংহ : 'মহাভারত' (২য় খণ্ড), পৃ: ২৮০, তুলিকলম, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৮

১৭. উৎপল দত্ত : 'গিরিশ মানস', পৃ: ২৩৩, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮

১৮. সম্বাদ প্রভাকর, ২৮ জুন, ১৮৪৮

১৯. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪১১, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

২০. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪১৩, ঐ

২১. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪১৫, ঐ

২২. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪১৫, ঐ

২৩. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪১৭, ঐ

২৪. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪১৭, ঐ

২৫. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪২০, ঐ

২৬. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪২২, ঐ

২৭. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৪২৭, ঐ

২৮. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৫১০, ঐ

২৯. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৫০৮, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৩০. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৫১০, ঐ

৩১. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৫১১, ঐ

৩২. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৫১৩. ঐ

৩৩. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৩৭৩, ঐ

৩৪. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৩৭৫, ঐ

৩৫. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৩৮১, ঐ

৩৬. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৩৮৫, ঐ

৩৭. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ৩৮৭, ঐ

৩৮. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ১০৭০, ঐ

৩৯. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ: ১০৬৯, ঐ

৪০. মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনাকাব্য - পৃ: ৫৫ মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

৪১. মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনাকাব্য - পৃ:৫৬, ঐ

৪২. মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনাকাব্য - পৃ:৫৭, ঐ

৪৩. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ:১০৬৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৪৪. মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনাকাব্য, পৃ:৫৯, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

৪৫. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক', পৃ:১১৪, বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ,২০১১

৪৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড), পৃ:৪০৬, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯

৪৭. সুধীরচন্দ্র সরকার : 'পৌরাণিক অভিধান'(সংকলিত), পৃ:২১১ এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, দশম সংস্করণ, ১৪১৮

৪৮. উৎপল দত্ত : 'গিরিশ মানস', পৃ: ২৫০, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮

৪১. মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনাকাব্য - পৃ:৫৬, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

৪২. মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনাকাব্য - পৃ:৫৭, ঐ

৪৩. কাশীরাম দাস : মহাভারত, পৃ:১০৬৯, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ-২০১৩

৪৪. মধুসূদন দত্ত : বীরাঙ্গনাকাব্য - পৃ:৫৯, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, মুদ্রণ ২০০৬

৪৫. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, : 'বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক', পৃ:১১৪, বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণ,২০১১

৪৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস' (১ম খন্ড), পৃ:৪০৬, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৯,

৪৭. সুধীরচন্দ্র সরকার : 'পৌরাণিক অভিধান'(সংকলিত), পৃ:২১১ এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, দশম সংস্করণ, ১৪১৮,

৪৮. উৎপল দত্ত : 'গিরিশ মানস', পৃ: ২৫০, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৮